# পূজার অর্ঘ্য



শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত

প্রকাশক

শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র মজুমদার

বিজয়া সাহিত্য-মন্দির

কাশীধাম ও রাজসাহী।



[মূল্য ১।০

প্রাপ্তিস্থান

বিজয়া সাহিত্য-মন্দির
কুরাঘাট—গোরক্ষপুর।

ডি, এম, লাইব্রেরী
৬১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ও
অন্যান্য প্রধান্ প্রধান পুস্তকালয়।

প্রবাসী প্রেস,
৯১, আপার সার্কুলার রোড কলিকাতা।
শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

# উৎসর্গ

—০—

যাঁহা হইতে এই নশ্বর শরীর পাইয়াছিলাম, আমার
সেই চিরারাধ্যা জননী ভগবৎ শ্রীচরণলীনা
সিদ্ধেশ্বরী দেবীর শ্রীচরণকমলোদ্দেশে
আমার এই পূজার অর্ঘ্য সন্তাপের
পুষ্পাঞ্জলিরূপে ভক্তিভরে
অর্পণ করিলাম।

সুরেশ

# উপহার

—*—

# গ্রন্থকারের নিবেদন

এই পুস্তকে প্রকাশিত গল্পগুলির মধ্যে "মানসী", "সতীরাণী" ও "বিষাদ-প্রতিমা" ( নির্ব্বুদ্ধিতা নামে ) সুপ্রসিদ্ধ গল্প-লহরী পত্রিকায় এবং পল্লীবিরাগ অধুনালুপ্ত "পুষ্পোদ্যান" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। "অপরাজিতা" ও "অমিয়কুমার" আমার বহু পুরাতন খাতা হইতে অতি কষ্টে উদ্ধার করিয়া এই সঙ্গে সংযোজিত করিয়া দিলাম। যাঁহারা গল্প পুস্তকে শুধু নির্লজ্জ প্রেমের কাহিনী বা নগ্ন আর্টের চিত্রই দেখিতে চাহেন, তাঁহারা পুস্তকখানি পাঠ করিলে নিরাশ হইবেন সন্দেহ নাই; তবে এক-শ্রেণীর পাঠকের ইহা ভাল লাগিতে ও কিঞ্চিৎ আনন্দের কারণ হইতে পারে মনে করিয়াই ইহা প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছি। আর্ট বা সাহিত্যসৃষ্টির স্পর্দ্ধা আমি রাখি না; তবে প্রত্যেক গল্পের মধ্যেই আমাদের সমাজের ও দেশের ব্যাধি কোথায় ও তাহার প্রতীকার কি, তাহা কথাচ্ছলে দেখাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমার একমাত্র লক্ষ্য দেশের সেবা; সেই লক্ষ্যে কতদূর অগ্রসর হইয়াছি, সুধী পাঠকবর্গই তাহার বিচার করিবেন।

গোবিন্দধাম
আগদিমা—রাজসাহী
অক্ষয় তৃতীয়া, সন ১৩৩৫

বিনীত
শ্রীসুরেশচন্দ্র শর্ম্মগুপ্ত

# সূচী

# সতী-রাণী

## প্রথম পরিচ্ছেদ

পিতৃদেবকে জানিবার সৌভাগ্য জীবনে আমার হয় নাই; আমার জন্মের অতি অল্প কয়েক দিন পরেই তিনি আমাদের মায়াসূত্র ছিন্ন করিয়া দিব্যধামে চলিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার বিয়োগ-ব্যথাও আমাকে কখন ভোগ করিতে হয় নাই। স্নেহময় বড়দাদা অম্লানবদনে সংসারের সমস্ত ভার বহন করিয়া যাইতেন। এমনিভাবে বহুদিন অতীত হইবার পর হঠাৎ একদিন আমাদের সুখের সংসারে কাল-বৈশাখী দেখা দিল, এবং দেখিতে দেখিতে তাহা হইতে ঝড় ঝঞ্ঝা ও বজ্রপাত হইয়া আমায় জীবন্মৃত করিয়া চলিয়া গেল। আমি স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কলেজে পড়া শেষ করিয়া বি-এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলাম। যেদিন আমার পরীক্ষা আরম্ভ, ঠিক তাহার পূর্ব্বদিন দাদা হঠাৎ অতি কঠিন পীড়ায়

আক্রান্ত হইলেন। তাঁকে এমন অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া আমি কেমন করিয়া পরীক্ষা দিতে যাইব? এদিকে গৃহে আমি দাদার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত রহিলাম, ওদিকে আমার পরীক্ষার দিন অতীত হইয়া গেল। তারপর কয় দিন অতীত হইলে তিনি এই জ্বালা যন্ত্রণাময় সংসার ছাড়িয়া কোন্ এক অজানা রাজ্যে চলিয়া গেলেন। তাঁহাকে হারাইয়া আমি চারিদিক অন্ধকার দেখিলাম। আমার অবস্থা ঠিক লক্ষ্যচ্যুত কক্ষভ্রষ্ট গ্রহের মত হইল, অকুল সংসার-সমুদ্রে আমি নাবিক-হীন তরণীর ন্যায় হইলাম। আহা, আমার সেই দুঃখের দিনগুলি কি এ জীবনে ভুলিবার?

দাদার অভাবে এখন আমাকেই সংসারের ভার মাথা পাতিয়া লইতে হইল। আমাদের অবস্থা তেমন স্বচ্ছল ছিলনা; রোজ আনা, রোজ খাওয়া—কতকটা এমনি ভাবেই চলিতেছিল। স্বর্গীয় পিতৃদেব প্রতিবাসীদের চক্রান্তে কয়টি মিথ্যা মোকদ্দমায় জড়িত হইয়া বিস্তর টাকা ঋণ করিয়া গিয়াছিলেন। সেই ঋণের দায় হইতে মুক্তি পাইবার জন্যই দাদা জোত জমা সমস্ত বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তারপর যাহা কিছু সামান্য হাতে ছিল, দাদার শ্রাদ্ধাদি কাজে তাহাও সমস্ত খরচ হইয়া গেল। এখন আমি কিছু কিছু উপার্জ্জন করিয়া না আনিলে

আর সংসারের কাহারও মুখে অন্ন যাইবেনা ; অগত্যা আমাকে চাকুরীর খোঁজে বাহির হইয়া পড়িতে হইল।

মহামায়ার ইচ্ছায় এর জন্য আমাকে বেশী কষ্ট পাইতে হয় নাই। আমি দাদার অস্থিখানি সঙ্গে নিয়া কলিকাতার পথে বাহির হইয়াছিলাম। উদ্দেশ্য—সেখানে ভাগীরথী গর্ভে উহা বিসর্জ্জন দিয়া পরে চাকুরীর খোঁজে অন্যত্র চলিয়া যাইব। এর মধ্যে রেল গাড়ীতেই ময়ুরভঞ্জ ষ্টেটের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইল ; তিনি আমার সমস্ত অবস্থা শুনিয়া বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন, এবং তাঁদের ষ্টেটে বন বিভাগে একটি চাকুরী দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। তাঁহারই প্রতিশ্রুতি অনুসারে আমি দাদার অস্থি খণ্ড কলিকাতায় গঙ্গাগর্ভে সমাহিত করিয়া তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই ময়ুরভঞ্জের রাজধানী বারিপদায় গমন করিলাম। বলা বাহুল্য তিনি আমাকে পঞ্চাশ টাকা বেতনের একটি ইন্‌স্পেক্টরের কাজ প্রদান করিলেন। আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া এই চাকুরীই গ্রহণ করিলাম, এবং সংসারের সকলকে ক্ষুধার জ্বালা হইতে রক্ষা করিতে পারিব বলিয়া চিন্তার হাত হইতে কতকটা অব্যাহতি পাইলাম।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এমনই ভাবে প্রায় দুই বৎসর কাটিয়া গেল। ইহার মধ্যে আমি বাড়ী যাইবার জন্য মা ও বউদিদির নিকট হইতে বহু তাগিদ পত্র পাইয়াছি, কিন্তু হাতে টাকা কড়ি কিছুই জমাইতে পারি নাই বলিয়া তাঁদের আদেশ পালন করা সঙ্গত মনে করি নাই। যাহা হউক এবার পূজার সময় মার বিশেষ আহ্বানে বাড়ী গেলাম। পূজা তো কাটিয়া গেল। তারপর এক দিন দুপুরে আমি খাইতে বসিয়াছি মা পাখা লইয়া পাশে বসিয়া বাতাস করিতেছিলেন। একথা সে কথার পর মা বলিলেন "বিনয়! এইবার তুই বিয়ে কর্, তা হ'লেই আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে পরকালের চিন্তায় মন দি।" আমি বলিলাম "না মা, আমি এখন বিয়ে কর্‌বনা" মা বলিলেন,—"সে কি বলিস্, এখন কি আর বিয়ে না কর্‌লে ভাল দেখায়?" আমি বলিলাম,—"তা হ'লে মা, আমি কিন্তু ব্রাহ্মঘরে বিয়ে কর্‌ব। তোমাদের সমাজে তো আর ভাল ইংরিজী লেখাপড়া জানা মেয়ে পাবার উপায় নাই; তোমাদের হিন্দু সমাজ মেয়েদের শুধু গারদে পুরে রাখতেই জানে। সুতরাং ব্রাহ্ম ঘরে ভিন্ন

আর ভাল মেয়ে কোথায় পাবে বল?” মা বলিলেন, “অমন পাগলামি করিস্‌নে বাবা; ব্রাহ্ম ঘরে ভিন্ন কি আর ভাল মেয়ে পাওয়া যায় না? তুই কেবল রাজী হ’লেই হয়; আমি লেখা পড়া জানা ভাল মেয়ে দেখে ঠিক কর্‌ছি।” আমি বলিলাম “তোমরা জবরদস্তি বিয়ে দেবে দাও; কিন্তু বউ যদি আমার মনের মত না হয়, তা হ’লে কিন্তু আর কখন বাড়ী আস্‌বনা তা এই ব’লে দিচ্ছি।” ইহার কয়দিন পরে আমার ছুটি ফুরাইয়া গেল, আমি পুনরায় কার্য্যস্থলে চলিয়া গেলাম।

এক দিন সফরে বাহির হইয়া তাম্বুতে বসিয়া রাজকার্য্য করিতেছি, এমন সময়ে ডাকঘরের হরকরা আসিয়া আমার হাতে একখানি পত্র দিয়া চলিয়া গেল। উপরের শিল মোহর দেখিয়া বুঝিলাম যে, পত্রখানি আমার হেড কোয়াটার হইতে রিডাইরেক্ট হইয়া আসিয়াছে। বাড়ীর পত্র বুঝিতে আর বিলম্ব হইলনা; সুতরাং সমস্ত কাজ ফেলিয়া অগ্রে উহা পড়িতে বসিলাম। পত্রখানি এই :—

পরম স্নেহাস্পদেষু।

স্নেহের ঠাকুর পো,

কয় দিন তোমার পত্র পাই নাই। শীঘ্র তোমার সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল সংবাদ লিখিয়া চিন্তা দূর করিবে।

তারপর রতনপুরের শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর লাহিড়ী মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী প্রতিভা দেবীর সহিত তোমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করা হইয়াছে, এবং আগামী মাসের ১২ই তারিখ শুভবিবাহের দিন ধার্য্য হইয়াছে। মেয়েটি দেখিতে খুব ভাল, এবং লেখা পড়া জানে। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। কিরণের বিবাহে আমি ও মা রতনপুরে গিয়াছিলাম, তাহাতেই মেয়ে দেখিয়া আমাদের পছন্দ হইয়াছে। তুমি উক্ত তারিখের পূর্ব্বে ছুটি লইয়া বাড়ী আসিবে। এখানকার সমস্ত মঙ্গল; তুমি আমাদের আশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি

আঃ—তোমার বৌদিদি

পত্রখানি পড়িয়া আমার মনের মধ্যে কেমন একটা ঘোর চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল; ফলে তখনই আমাকে কাজকর্ম্ম বন্ধ করিয়া একাকী সান্ধ্য-ভ্রমণের জন্য বাহির হইতে হইল; এবং রাত্রি আটটার পূর্ব্বে আর সেদিন আমি ভ্রমণ শেষ করিয়া তাম্বুতে ফিরিতে পারি নাই। তারপর ফিরিয়া আসিয়া যথা-সময়ে আহারাদি শেষ করিয়া লইলাম, এবং আরাম কেদারায় শুইয়া শুইয়া একখানা দৈনিক কাগজ লইয়া পড়িতে লাগিলাম। মনে আমার তখন পূর্ণ অশান্তি, সুতরাং বলা বাহুল্য যে কাগজ পড়িতে ভাল লাগিলনা। কাগজ ফেলিয়া একখানা মাসিক পত্র

লইয়া কেবল তাহার পাতা উল্টাইতে লাগিলাম—কোনটা পড়িয়াই ভাল লাগিতেছিল না। শেষে কাগজ কলম•• লইয়া একখানা ছুটির দরখাস্ত লিখিলাম, এবং স্বয়ংই ডাকঘরে যাইয়া পত্রখানা চিঠির বাক্সে ফেলিয়া দিয়া আসিলাম।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যথাসময়ে আমি ছুটি লইয়া বাড়ী আসিলাম; তারপর বৌদিদির সঙ্গে দেখা হইতেই বলিলাম,—"বউদি! এ বিয়ে আমি কিছুতেই কর্‌ব না।" বউদিদি একটু হাসিয়া বলিলেন,—"ব্যস্ত হচ্ছ কেন ঠাকুরপো? সেই ছোট্ট রাঙা মানুষটি যখন তোমার কোলের মধ্যে আসিয়া শুইবে, তখন তোমার সমস্ত রাগ একেবারে জল হইয়া যাইবে।" আমি গম্ভীর হইয়া বলিলাম,—"ওসব কথায় আমি ভুল্‌ছি না বউদি, আমি নিজে ভাল ক'রে না দেখে শুনে কিছুতেই বিয়ে কর্‌তে পার্‌বো না।" বউদিদিও হঠাৎ গম্ভীরভাবে বলিলেন,—"আমরা তোমার শত্রু নই ঠাকুরপো; যে মেয়ে আমরা ঠিক করিয়াছি, রূপে-গুণে কোন অংশেই সে তোমার অযোগ্য নয়। শুধু কেন একটা বাড়াবাড়ি ক'রে লোক হাসাবে, আর অযথা মা'র মনে কষ্ট দেবে?" আমি অগত্যা বিবাহ করিতে স্বীকার করিলাম বটে, কিন্তু বউদিদিকে স্পষ্ট বলিলাম,—এর ষোলআনা দায়িত্বই আপনার—আমি এ সম্বন্ধে কিছুই জানি না তা মনে রাখ্‌বেন।" বউদিদি বলিলেন,—"হাঁ, আমিই এর জন্য দায়ী রহিলাম।"

আমি খুসী হইলাম না বটে, কিন্তু মা ও বৌদির ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করিতেও পারিলাম না। নির্দ্দিষ্ট দিনে আমাদের শুভবিবাহ নির্ব্বিঘ্নে শেষ হইয়া গেল।

বাসী বিবাহের পরদিন আমি ছেলেদের ক্রিকেট খেলা দেখিতে গিয়াছি, এমন সময়ে একটি ছেলে আসিয়া আমাকে বলিল,—"বিনয় দা! তুমি না বড় বড়াই করেছিলে যে ব্রাহ্মঘরে বিয়ে কর্‌বে! এখন এ কি হ'ল? একেবারে ভট্‌চাজের মেয়েকে বিয়ে কর্‌লে? আমি বলিলাম,—"তা হউক, লেখাপড়া জানিলেই হইল।" সে পুনরায় বলিল,—কতদূর লেখাপড়া জানে তাহার খবর লইয়াছ কি? ও যে আমায় মামার বাড়ীর মেয়ে। উহার বিদ্যার দৌড় আমার বেশ জানা আছে।" কথাটা শুনিয়া আমি একেবারে দমিয়া গেলাম এবং কিছু না বলিয়া একটু পরেই বাড়ী চলিয়া আসিলাম।

বাড়ী ফিরিয়াই আমি বৌদিদিকে ডাকিয়া বলিলাম,—"বউদিদি! আমার ছুটি ফুরাইয়া গিয়াছে; এই সন্ধ্যার ট্রেণেই আমাকে যাইতে হইবে। যাহা হয় কিছু খাবার আনিয়া দিন্।" বউদিদি শুনিয়া একেবারে অবাক্ হইয়া গেলেন। প্রথম বিস্ময় দূর হইলে তিনি বলিলেন,—"ওমা, সে কি কথা, আজ যে তোমার ফুলশয্যা।" আমি বলিলাম,—"থাক্, আর ফুলশয্যায়

দরকার নাই ; ঢের হইয়াছে ; এখন শীঘ্র শীঘ্র আমি অব্যাহতি পাইলেই বাঁচি।” বউদিদি নিকটে আসিয়া আমার হাত ধরিয়া স্নেহমিশ্রিত অতি মিষ্টস্বরে বলিলেন,—“ছি ঠাকুরপো, অমন পাগলামি করিও না। আজ এই আনন্দের দিনে কি এমন করিয়া নিরানন্দ ডাকিতে আছে ? তুমি না আমায় ভক্তি কর—ভালবাস—আমার একটা কথাও কি রাখিবে না ?” বউদিদির এই স্নেহমিশ্রিত কথাগুলি শুনিয়া আমার চক্ষে জল আসিল। সুতরাং আর আমি তাঁহার উপর রাগ করিতে পারিলাম না। রুমালে চক্ষু পরিষ্কার করিয়া লইয়া তাঁহাকে বলিলাম,—“বউ-দিদি ! আপনার কথা না হয় রাখিলাম, কিন্তু আপনারা কি আমাকে আনন্দ করিবার অবকাশ দিয়াছেন ? আমার চির-জীবনের সমস্ত সুখশান্তি কি আপনারা নষ্ট করিয়া দেন নাই ?” বউদিদি আগ্রহের সহিত বলিলেন,—“কেন—কেন—কি হইয়াছে ?” আমি বলিলাম,—“আপনারা কোথা থেকে একটা জঙ্গলা মেয়ে আনিয়া তাহারি সহিত বিবাহ দিয়া দিলেন, অথচ বিবাহের আগে আমার একবার মত লওয়ারও অপেক্ষা করিলেন না। আবার বলিতেছেন—কেন ?” বউদিদি পূর্ব্বের ন্যায় স্নেহমিশ্রিত স্বরে বলিলেন,—“ঠাকুরপো, তুমি ভুল বুঝিয়াছ। যাহার সহিত তোমার বিবাহ হইয়াছে, সে জঙ্গলা নয়, পরন্তু

পরম রূপবতী ও বিদুষী। অন্য যে কেহ তাহাকে পত্নীরূপে পাইলে আপনাকে সৌভাগ্যবান মনে করিত। কিন্তু আমাদের ঘোর দুর্ভাগ্য যে, এমন লক্ষ্মী সতীরাণীও তোমার পছন্দ হয় নাই। যাহা হউক, আজ ফুলশয্যা—আজ রাত্রেই সমস্ত জানিতে পারিবে। আগে থাকিতেই এমন ব্যস্তসমস্ত হইও না। বউদিদির সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া আমি সে রাত্রের মত থাকিতে সম্মত হইলাম বটে কিন্তু বাড়ীর ভিতর শুইতে যাইবার কথায় স্পষ্ট অস্বীকার করিলাম।

রাত্রে আহারাদি শেষ করিয়া আমি বাহির বাটীর ঘরে ফরাসের উপর একটা বালিশ লইয়া শুইয়া পড়িলাম। তারপর চাকর-বাকর সকলে আহারাদি করিয়া একে একে যে যাহার স্থানে যাইয়া শয়ন করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে ঝি আসিয়া আমাকে বলিল,—"ছোটবাবু! বৌদিদি তোমায় ডাক্‌ছেন; ঐ খিড়কীর কাছে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন।" আমি তাহাকে বলিলাম,—"তুই তাঁকে গিয়ে বল্‌গে যে, আমি এখানেই শুয়ে পড়েছি, আর বাড়ীর ভেতর যেতে পার্‌বো না।" ঝী চলিয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে সে পুনরায় আসিয়া উপস্থিত হইল। এবার বউদিদিও তাহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন। বউদিদি আসিয়াই আমার হাত ধরিয়া বলিলেন,—"চল,—উঠ—আর পাগলামী

করিও না; ছেলেমানুষ—হয়ত এতক্ষণ ঘুমে টলিয়া পড়িয়াছে। আমি বলিলাম,—বউদিদি, আমি এখানে বেশ আছি, কেন আর আমাকে অযথা কষ্ট দিবেন?" কিন্তু তিনি কিছুতেই ছাড়িলেন না। অগত্যা উঠিয়া তাঁহার সহিত আমাকে বাড়ীর মধ্যে যাইয়া শয়ন করিতে হইল।

গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখি, মেজের এক কোণে টেবিলের উপর প্রকাণ্ড একটা সিজের আলো, বিছানার উপর রাশিরাশি ফুল ও গন্ধদ্রব্য ছড়ান; আর বিছানার একপ্রান্তে আমার নবপরিণীতা পত্নী শ্রীমতী প্রতিভা নিদ্রার ঘোরে বিচেতন। দক্ষিণ পার্শ্বের জানালা দিয়া বসন্তের মন্দ-মন্দ নৈশ-সমীরণ গৃহে প্রবেশ করিতেছিল, এবং তাহাতেই প্রতিভার মুখের কাপড়খানা হঠাৎ সরিয়া গেল। আমি তাহার সেই অপূর্ব্ব মুখচ্ছবি দেখিয়া ক্ষণেকের জন্য আত্মবিস্মৃত হইলাম। কি মধুর মিষ্টশ্রী। বাস্তবিক প্রথম দর্শনে আমার বোধ হইল, যেন কোন স্বর্গের অপ্সরা তাহার অতুলনীয় সৌন্দর্য্যরাশি লইয়া আমার বিছানার এক-প্রান্তে শুইয়া আছে। প্রথম বর্ষায় তটিনীর যে আবেগ, নব-বসন্তাগমে ব্রততীর যে হরিৎ সৌন্দর্য্য, প্রতিভার উদ্ভিন্নযৌবন স্ফুটনোন্মুখ কমনীয় দেহে সেই আবেগ ও সৌন্দর্য্যরাশি তরঙ্গিত হইতেছিল। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত—স্বপ্নাবিষ্টের মত তাহার দিকে

চাহিয়া রহিলাম। একবার ইচ্ছা হইল, তাহার সেই ফুল্ল-রক্ত-কুসুমকান্তি অধর-যুগলে——কিন্তু তখনই মনে হইল, "ছি! ছি! এই কি আমার মনের বল? যে আমার আদৌ উপযুক্ত নহে, তাঁহার শুধু বাহ্যিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইলাম?" এই সময় একটা দম্‌কা হাওয়া আসিয়া আমার টেবিলস্থিত বাতি নিবাইয়া গৃহ অন্ধকার করিয়া দিয়া গেল। আমিও অমনি ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া বিছানার একপ্রান্তে শুইয়া পড়িলাম।

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পরদিন আমি আমার বাড়ীর সকলের নিষেধ, অনুরোধ, উপরোধ অগ্রাহ্য করিয়া সন্ধ্যা আটটার ট্রেণে বারিপদায় রওনা হইয়া আসিলাম। আমার মনের অবস্থা এখন বর্ণনাতীত। ঝড় আসিবার পূর্ব্বে প্রকৃতি যেমন গম্ভীর ও স্তব্ধ মূর্ত্তি ধারণ করে, আমার অবস্থাও কতকটা সেইরূপ দাঁড়াইল। দুইহাতে ঠেলিয়াও দিনগুলা কোনক্রমেই কাটে না। কিন্তু তবু কাটিতেই হইল। ১৫।২০ দিন কোন রকমে চলিয়া গেল। তারপর একদিন ডাকযোগে একই সঙ্গে খামেভরা দুইখানি পত্র পাইলাম। প্রথম পত্র খুলিয়া দেখিলাম, উহা আমার জ্যেষ্ঠা শ্যালিকার পত্র। তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন :—

বিনয়বাবু!

তোমার সঙ্গে এ পর্য্যন্ত আমার আলাপ-পরিচয় বা দেখা-সাক্ষাৎ হয় নাই; এমন অবস্থায় হঠাৎ পত্র লেখাটা তেমন ভাল দেখাইবেনা। কিন্তু না লিখিয়াও ত থাকিতে পারিনা। তুমি শ্রীমতী প্রতিভার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছ, তাহাতে বাধ্য হইয়া আমাকে এরূপ অবস্থাতেও পত্র লিখিতে হইল।

তুমি হয়ত আমাকে খুব মুখরা বলিয়া মনে করিবে। তা যাই মনে কর, আমি কিন্তু সত্যকথা বলিতে ভয় করিব না। তুমি না আপনাকে শিক্ষিত বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাক? সেই জন্যই কি নবপরিণীতা পত্নীর সহিত প্রথম রাত্রেই এমন হৃদয়-হীনতার পরিচয় দিয়াছ? বিবাহের পর একরাত্রের মধ্যে নববধূর যে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হয়, তাহা যাহারা লক্ষ্য করিয়াছে তাহারাই আশ্চর্য্য হইয়াছে। চঞ্চলা অস্থিরা বালিকা এক রাত্রির মধ্যে আশ্চর্য্য গম্ভীরতা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সেই অবস্থায় বালিকার প্রকৃত মনের ভাব জানিয়া লওয়া যে কত কঠিন, তাহা আমি তোমাকে কেমন করিয়া বুঝাইব? যখন প্রতিভা বিবাহের পর শ্বশুর বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিল, তখন আমি তাহার গম্ভীরতা দেখিলাম বটে, কিন্তু নববধূর মনে যে একটা নিরাবিল আনন্দ ও উৎসাহ বিরাজ করিতে থাকে, তাহার কিছুই তাহাতে খুঁজিয়া পাইলাম না। তাহার পরিবর্ত্তে একটা বিষাদের ঘন কালিমা তাহার হৃদয়ে অঙ্কিত দেখিতে পাইলাম। তখনই আমি বুঝিলাম যে, প্রতিভা তোমার নিকট কখনই সদ্ব্যবহার পায় নাই; পাইলে তাহার হৃদয়ে ওরূপ বিষাদের ছায়া কখনই দেখিতাম না। তারপর অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম যে, আমি

যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলাম তাহার একবর্ণও মিথ্যা নয়। কেমন— একথা অস্বীকার করিতে পার কি?

বহু কৌশল করিয়া তবে আমি প্রতিভার নিকট হইতে কথাগুলি বাহির করিয়া লইতে সক্ষম হইয়াছি। শুনিলাম, ফুলশয্যার রাত্রে তোমাদের স্বামীস্ত্রীতে কথাবার্ত্তা কিছুই হয় নাই। বহুক্ষণ ধরিয়া তোমার জন্য অপেক্ষা করিয়া করিয়া অবশেষে বালিকা নিদ্রিতা হইয়া পড়িয়াছিল। তারপর তুমি যাইয়া তাহাকে জাগাইয়া তোলা দূরে থাকুক, চুপি চুপি ঘরের বাতিটি নিবাইয়া দিয়া বিছানার এক প্রান্তে শুইয়া পড়িয়াছিলে। পরদিনই আবার কার্য্যস্থলে চলিয়া গিয়াছ। ইহাতে কি বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায় নাই?

তুমি নিজে শিক্ষিত হইয়া কেন যে বিরাট মূর্খের মত এমন ব্যবহার করিলে, তাহা আমার সামান্য বুদ্ধিতে বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। তবে বাজারে রাষ্ট্র যে প্রতিভা ইংরেজী লেখাপড়া জানেনা, তাহাতেই তোমার অপছন্দ হইয়াছে। যদি তাহাই হয়, তবে তোমার এই আচরণকে ঘোর গোঁয়াতুমী ও বেকুফী ভিন্ন আর কিছুই বলিতে পারিনা। তোমার ১নং বেকুফী এই যে, তুমি তাহার সঙ্গে আলাপ না করিয়াই তাহার সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিয়াছ; এবং ২নং বেকুফী এই

যে, তুমি আপনার স্ত্রীকে নিজের মনের মত করিয়া গড়িয়া না লইয়া, চোরের উপর রাগ করিয়া মাটিতে ভাত খাওয়ার মত বাড়ীর সকলের উপর রাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছ। ইহাকে কি বুদ্ধি বলিব? যাহাহউক, আমি এই বলিয়া রাখিলাম যে, তোমার এই বেকুফীর জন্য তোমাকে যথেষ্ট পরিতাপ করিতে হইবে। আজ এই পর্য্যন্ত। ফেরৎডাকে তোমার মঙ্গল-সংবাদ সহ পত্রোত্তর দিয়া সুখী করিবে।

ইতি। আঃ শ্রীমতী........দেবী।

প্রথম পত্র সমাপ্ত করিয়া পরে দ্বিতীয়খানি পাঠ করিলাম। এখানি আমার বউদিদির পত্র। তিনি নিম্নোক্তরূপে লিখিয়াছেন :—

পরম স্নেহাস্পদেষু।

স্নেহের ঠাকুরপো! তুমি বাড়ী হইতে যাইবার পর এপর্য্যন্ত আমাদিগকে কোনও পত্রাদি লেখ নাই; তজ্জন্য আমরা যে কিভাবে আছি, তাহা তোমাকে বুঝাইতে যাওয়া বৃথা। যাহা-হউক ফেরৎ ডাকে তোমার মঙ্গল-সংবাদ লিখিয়া চিন্তা দূর করিবে।

আজিকার পত্রে তোমার পূর্ব্ব আচরণের কথা বেশী কিছু তুলিব না, তবে সংক্ষেপে দুই একটা আবশ্যক কথা বলিয়া

যাইতেছি। তোমার ফুলশয্যার রাত্রের ব্যবহারের কথা জানিয়া মা দুঃখে ও ক্ষোভে মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া-পড়াইয়া তবে কতকটা আশ্বস্ত করিতে পারিয়াছি। মা তো প্রথমে কিছুতেই শান্ত হন না, আমি তাঁহাকে অনেক বুঝাইলাম, বলিলাম যে, ঠাকুরপোর এখন যেসব ভাবভঙ্গী দেখিতেছেন, তাহা বেশী দিন থাকিবে না। প্রতিভা ইংরেজী লেখাপড়া জানে না সত্য, কিন্তু সে যে অতুলনীয় সৌন্দর্য্যরাশির অধিকারিণী, তাহাই অবশেষে ঠাকুরপোকে বশ করিয়া ফেলিবে। রূপের মোহে আকৃষ্ট হয় না, এমন লোক কোথাও দেখিয়াছেন কি? কেত যোগী-ঋষি পার পাইয়া গেলেন, আর এতো ক্ষুদ্র ঠাকুরপো।' আমার এইসব কথায় মা অবশেষে কতকটা আশ্বস্ত হইয়াছেন। আমি যাহা অনুমান করিয়াছি, তাহা সত্য নহে কি?

বাস্তবিক প্রতিভা যেরূপ অতুলনীয় সৌন্দর্য্যরাশির অধিকারিণী, তেমন সৌন্দর্য্য খুঁজিয়া তুমি আর কোথাও পাইবে না। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, তুমি তাহার এই যৌবন-ফাঁদে নিশ্চিত ধরা পড়িবে।

দেখ, আর একটা কথা তোমায় না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। তোমার অভিমানের কারণ এই যে, তোমার স্ত্রী ইংরেজী

লেখাপড়া জানে না। বাস্তবিক তোমার যদি এমনই অভিরুচি হয় যে, মেম সাহেব না হইলে কিছুতেই চলিবে না, তাহা হইলে তুমি নিজে তোমার স্ত্রীকে মনের মত করিয়া শিখাইয়া-পড়াইয়া লইতে পার না কি ? আর তোমার এরূপ উদ্ভট রুচিই বা কেন, তাহাও ত আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিতে পারিনা। যাহাহউক, আমাকে প্রতিভার হইয়া বেশী ওকালতী করিতে হইবে না, কেননা প্রতিভা স্বয়ং সব্যসাচী। পত্র অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া গেল। সুতরাং আজ এইখানেই ইহার পরিসমাপ্তি করিতে বাধ্য হইলাম। বারান্তরে অন্যান্য কথা বলিব। ইতি

আশীর্ব্বাদিকা

তোমার বৌদিদি

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পরদিন আমি রাত্রিতে আহারাদি সমাপন করিয়া পূর্ব্বোক্ত পত্র দুইখানির জবাব লিখিতে বসিলাম, এবং অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে স্থির করিলাম যে, আমার শ্যালিকার লিখিত পত্রখানির কোনও জবাব দেওয়া হইবে না, কেননা তাঁহাকে জবাব দিবার বড় কিছু ছিল না। তারপর অনেক ভাবিয়া ভাবিয়া আমার পরম পূজনীয়া বউদিদিকে একখানি সুদীর্ঘ পত্র লিখিলাম। পত্রখানি সমাপ্ত হইলে মনে মনে পাঠ করিলাম :—

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু।

স্নেহময়ী বৌদিদি, আপনার আশীর্ব্বাদী পত্র পাইয়া যারপরনাই সুখী হইলাম। আমি এখানে শারীরিক বেশ ভাল আছি, সেজন্য আপনাদের কিছুমাত্র চিন্তার কারণ নাই।

আপনি আপনার সুচিন্তিত পত্রে যে সকল কথার অবতারণা করিয়াছেন, তাহার সকলগুলির জবাব আমি এস্থলে দিব না, কেননা, তাহার অধিকাংশ বিষয়েই মতভেদ অনিবার্য্য। সুতরাং সে সম্বন্ধে আপাততঃ নীরব থাকাই আমি বুদ্ধিমানের কার্য্য বলিয়া মনে করি।

আঁমার নিতান্ত দুর্ভাগ্য এই যে, আপনারা আমাকে পাকড়াও করিবার জন্য গুণের আশ্রয় না লইয়া রূপের আশ্রয় লইয়াছেন। রূপ কিছু চিরস্থায়ী নয়, কিন্তু গুণ চিরস্থায়ী। আপনারা আমার বিবাহের সময় এই সত্যটী মনে রাখিলে আমি চিরবাধিত হইতাম।

প্রতিভার রূপ আছে, একথা আমি অস্বীকার করি না। ফুল-শয্যার রাত্রে আমি তাহার বিকাশোন্মুখ যৌবনের আধফুটন্ত রূপ দেখিয়া ক্ষণেকের জন্য আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলাম। কিন্তু সৌভাগ্য-ক্রমে আমার সে মোহ অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় নাই। তজ্জন্য আমি আমার মানসিক বলের ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারি না। যতদিন আমার আমিত্ব থাকিবে, ততদিন আমি তাহার রূপের ফাঁদে ধরা পড়িব না, একথা সাহস করিয়া বলিতে পারি। যেদিন আমার এতটুকু মানসিক বল না থাকিবে, সেদিন আমার নিতান্ত দুর্ভাগ্যের দিন বলিয়া মনে করিব।

আপনি আমার রুচির প্রশংসা করিতে পারেন নাই, এবং তাহাকে উদ্ভট রুচি বলিয়া মনে করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, এ সম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ আছে। পূর্ব্বেই একথা বলিয়াছি, সুতরাং এখন বেশী কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

আপনার মতে আমি প্রতিভাকে ইচ্ছা করিলেই আমার

মনের মত করিয়া শিক্ষিতা করিয়া লইতে পারি। দুর্ভাগ্যক্রমে ততটুকু ধৈর্য্য আপাততঃ আমার নাই। যেদিন আমি এই কার্য্যে সফল হইব, সেদিন নিজেই নিজেকে অভিনন্দিত করিব সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

আপনি ও মাতৃদেবী আমার অসংখ্য প্রণাম জানিবেন এবং শ্রীমতী আশালতাকে আমার স্নেহাশীষ দিবেন। অধিক আর কি লিখিব; শ্রীশ্রীচরণে নিবেদন ইতি।

যথাসময়ে পত্রখানি ডাকে রওনা হইয়া গেল।

*　　　　*　　　　*

কয়দিনের মধ্যেই ইহার প্রত্যুত্তর পাইলাম। এবারও বৌদিদির পত্র পূর্ব্বের ন্যায়ই সুদীর্ঘ, এবং অত্যন্ত সুচিন্তিত ও সুলিখিত। তিনি নিম্নোক্তরূপ লিখিয়াছেন :—

পরম কল্যাণ বরেষু।

স্নেহের ঠাকুর পো! তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম, এবং তুমি শারীরিক ভাল আছ সংবাদে নিশ্চিন্ত হইলাম। পূর্ব্বপত্রে তোমাকে লিখিয়াছিলাম যে বারান্তরে অন্যান্য কথার আলোচন করিব; এজন্য এবার আরও দুই চারিটি কথা লিখিব। তবে এ সকল বিষয়ের বিস্তৃত ও যথাযথ আলোচনা এরূপ ক্ষুদ্র

পত্রে সম্ভবে না ; সাক্ষাতে সকল কথা বিস্তারিত শুনিতে পাইবে ; আপাততঃ সংক্ষেপেই বলিয়া যাইতেছি।

তোমার প্রধান কথা এই যে, বাঙ্গালা বা সংস্কৃতে কেহ মহা-মহোপাধ্যায় পণ্ডিত হইলেও যতক্ষণ তিনি একটু ইংরেজী না শিখিতেছেন, ততক্ষণ মানুষ বলিয়াই গণ্য হইবেন না। বলা বাহুল্য যে, তোমার এই উন্মত্ত প্রলাপ শুনিয়া কোনও কাণ্ডজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তিই হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবেন না। হইতে পারে তোমাদের ইংরেজী আজকাল অর্থকরী বিদ্যা ; হইতে পারে ইংরেজী না পড়িলে আজকাল কাহারও চাকুরী হয় না ; কিন্তু বিদ্যার যে একটা অসাধারণ মাহাত্ম্য, তাহা সকল বিদ্যারই আছে ; তা সে সংস্কৃতই হউক, আর বাংলাই হউক, আর হিব্রুই হউক। একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি। আচ্ছা, তোমার যে ইংরেজীর উপর এতটা ঝোঁক, ইহার কারণ কি তুমি বলিতে পার ? তুমি স্বয়ং ত বিশ্ববিদ্যার মন্দিরে অনেক যাওয়া আসা করিয়াছ ; কিন্তু তুমি কি বুকে হাত দিয়া বলিতে পার, সত্যসত্যই তুমি বিদ্যালাভ করিয়াছ ? তুমি কি তোমাদের জাতির সভ্যতার ইতিহাস পাঠ করিয়াছ ? সৃষ্টির কোন অতীত যুগে আমাদের এই ভারতবর্ষ জগতের জ্ঞানভাণ্ডারে কত মহামূল্য উপকরণ যোগাইয়াছে তাহার কি তুমি খবর রাখ ?

ভারতবর্ষ সেই অতীত যুগে সভ্যতার কোন্ উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছিল, তাহার কি তুমি বিন্দুবিসর্গও অবগত আছ? আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, যদি সত্যকথা বলিতে চাহ, তবে ইহার উত্তরে কখন না ভিন্ন হাঁ বলিতে পারিবে না। আর হাঁ বলিবেই বা কি প্রকারে? তোমাদের আধুনিক বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বিশ্বের যত অবিদ্যাই শিক্ষা দেওয়া হয়। তোমাদের মানুষ করিয়া তোলা ত সরকার বাহাদুরের ইচ্ছা নয়। তাহা না হইলে অমূল্য সংস্কৃত ভাষাকে তোমাদের বিদ্যামন্দির হইতে অর্দ্ধচন্দ্র দানের ব্যবস্থা হইতেছে কেন? যে ভাষার অমূল্য গ্রন্থসমূহের মধ্যে আমাদের দেশের সভ্যতার ইতিহাস নিহিত আছে; যে-ভাষার বেদ, উপনিষদ, দর্শন, পুরাণ, জ্যোতিষ, তন্ত্র আজিও জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে. তাহাকেও কর্ত্তারা আমোল দিতে চাহেন না। আর চাহিবেনই বা কেমন করিয়া? তাহা হইলে তাঁহাদের গোলামখানায় লোক জুটিবে কোথা হইতে? যাহা হউক আমার আশা আছে, একদিন-না-একদিন তোমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইবেই, সুতরাং আজ আর এবিষয়ে বেশী কিছু বলিব না।

তোমার আর একটী কথার জবাব দিয়া আমি পত্র শেষ করিব। তুমি লিখিয়াছ যে আমরা তোমাকে পাকড়াও করিবার

জন্য গুণের আশ্রয় লইবার পরিবর্ত্তে রূপের সাহায্য লইয়া নিশ্চয়ই ভাল কাজ করি নাই। বলা বাহুল্য যে আমরা পূর্ব্ব হইতে কোনরূপ ষড়যন্ত্র করিয়া তোমার অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হই নাই। শ্রীমতী প্রতিভা বহু সদ্‌গুণের অধিকারিণী। তুমি অন্ধ; তাই তাহার গুণরাশি দেখিতে পাও নাই; এবং সেইজন্যই আমাকে রূপের কথা তুলিতে হইয়াছিল! ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে এ দোষ আমাদের নহে, এ দোষ তোমারই।

যাহাহউক তুমি যত সত্বর পার, দিন সাতেকের বিদায় লইয়া বাড়ী আসিবে, বিশেষ প্রয়োজন আছে। অন্যথা করিও না— করিলে সমূহ অনিষ্ট হইবে। এখানকার সব কুশল। ইতি।

আশীর্ব্বাদিকা

তোমার বৌদিদি।

# ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বৌদিদির পত্র পাইয়াও আমি বাড়ী যাইবার কোন উদ্যোগ আয়োজন করিলাম না। স্থির করিলাম যে যদি এ বিষয়ে তাঁহার দ্বিতীয় পত্র পাই, তবেই যাইব, নতুবা নহে।

ইহার কয়েকদিন পরেই একদিন খামেভরা একখানি পত্র পাইলাম। উপরের হস্তাক্ষর অপরিচিত; কিন্তু বাঁকা বাঁকা হাতের লেখা দেখিয়া অনুমানে স্থির করিয়া লইলাম যে ইহা আমার পত্নীর লিখিত। বলা বাহুল্য, এই ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে আমার শিরায় শিরায় একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলিয়া গেল। সকল কাজ ফেলিয়া তখনই আমার শয়ন-প্রকোষ্ঠে আত্মগোপন করিলাম। যখন এ বিষয়ে আর সন্দেহ রহিল না যে লোকচক্ষুর দৃষ্টিগোচর হইবার কোন সম্ভাবনাই নাই, তখন কম্পিতহস্তে পত্রখানি খুলিয়া রুদ্ধ নিশ্বাসে উহা পাঠ করিলাম। পাঠক-পাঠিকাগণের কৌতূহল নিবারণের জন্য আমরা উহা অবিকল এইস্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"প্রিয়তমেষু।—

প্রাণেশ্বর! না—তোমাকে এ সম্বোধন ঠিক হইল কি না জানি না—যাহাহউক আশা করি আমার এ ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবে। আজি তোমাকে অনাহূত অবস্থায় পত্র লিখিয়া অতুল সাহসের—শুধু সাহসের কথাই বা বলি কেন, ঘোর নির্লজ্জতার পরিচয় দিলাম। আমার মানসিক অবস্থা যেরূপ, তাহাতে এ পত্র লিখা আদৌ সম্ভব হইত না; কেবল বড়দিদির প্রভাব অতিক্রম করিতে না পারায়—তাঁহারই পীড়াপীড়িতে কলের পুতুলের মত এ পত্র লিখিলাম।

দুর্ভাগ্যক্রমে আমি তোমার সুনজরে পড়ি নাই; পড়িলে ফুলশয্যার রাত্রে তোমার নিকট ওরূপ নির্দ্দয় ব্যবহার কখনই পাইতাম না। তোমা-কর্তৃক এরূপ নির্দ্দয়ভাবে উপেক্ষিতা হইয়াও যে আমি এখন পর্য্যন্ত প্রাণ ধারণ করিতেছি, ইহা আমার পিতৃদত্ত শিক্ষার ফল, কি আমার নিজের দুর্ব্বলতা, তাহা আমি শপথ করিয়া তোমাকে বলিতে পারি না। তবে একথা স্থির নিশ্চয় যে, আমার মতন অবস্থায় পড়িলে আজ-কালকার অনেক শিক্ষিতা যুবতীই পরিবার কাপড়ে কেরোসিন ঢালিয়া বধূলীলার পরিসমাপ্তি করিতেন; এবং সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রে তাঁহার বীরত্বের কথা চতুর্দ্দিকে কীর্ত্তিত হইত।

নাম কিনিবার এমন একটা সুযোগ যে হেলায় হাঁরাইয়াছি, তাহা কে অস্বীকার করিবে? আমার নিতান্ত দুর্ভাগ্য নহে কি? যাক্—

তুমি আমাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের একটু অবকাশও দাও নাই; কিসে যে আমি তোমার অযোগ্য, তাহাও কখন জানাও নাই। অথচ তুমি আমার কঠিন দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছ। দুর্ভাগ্যক্রমে তুমি একথা ভুলিয়া গিয়াছ যে, আমার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকেও এ দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। আমরা কোমল হৃদয়া সত্য, কিন্তু এ দণ্ড সহ্য করিতে আমরা কাতরা নই; কিন্তু তোমরা পুরুষ হইলেও এ সব কষ্ট সহ্য করিতে পারিবে না—অল্পেই ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া পড়িবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এখন পর্য্যন্তও আমি জানিতে পারি নাই যে তোমার নিকট আমি কি, অপরাধ করিয়াছি। তবে বড়দিদির নিকট শুনিলাম যে আমি ইংরেজী লেখাপড়া জানি না, তাই তোমার মনে ধরি নাই। হরি! হরি! হরি! এরই জন্য এত! আমি মনে করিয়াছিলাম, না জানি আরও কত কি! দেখ, আমি নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মেয়ে। পিতৃদেব আমাকে ইংরেজী শিখান নাই সত্য, কিন্তু তিনি আমাকে অতি যত্নসহকারে বাংলা ও সংস্কৃতের অনেক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ অধ্যয়ন

করাইয়াছেন। বাংলার প্রাচীন ও আধুনিক কোন প্রথিতনামা লেখকের পুস্তকই তিনি বাদ দেন নাই। সংস্কৃতেও বাল্মীকি, কালিদাস, ভারবী এবং মহামূল্য ভগবদ্গীতা আমাকে খুব ভাল করিয়াই পড়াইয়াছেন। তারপর ইতিহাস, ভূগোল ও অঙ্কশাস্ত্র —ইহাও মোটামুটী আমাকে শিখাইতে কসুর করেন নাই। এ সবই কি ইংরেজীর পরশপাথর বিনা কর্পূরের মত উপিয়া গেল? হায় দেশের কি দুর্ভাগ্য! এখন বাল্মীকি ব্যাসের বদলে লণ্ডন রহস্যের, মাখন ঘৃতের পরিবর্ত্তে চিকেন ব্রথের, ডাব ও মিছ্রীর পানার পরিবর্ত্তে চা-বিস্কুটের সমাদর। একপৃষ্ঠা ইংরেজী পড়িয়া নূতন আদপ-কায়দা না শিখিলে নব্য সোণার চাঁদেরা আর পছন্দ করেন না। করিবেনই বা কেন? তাহা হইলে পরস্ত্রী লইয়া রঙ্গমঞ্চে নাটক অভিনয়, বা বন্ধুবান্ধবকে লইয়া সস্ত্রীক উদ্যান-ভ্রমণ সম্ভব হইবে কেমন করিয়া? চাকুরে কেরাণী বাবুর তো মস্ত বিপদ! সাহেব তাঁহাকে অর্দ্ধচন্দ্র দান করিলে বিপন্না পত্নী বিশুদ্ধ ইংরেজীতে মেম সাহেবের স্তবস্তুতি করিবেন কেমন করিয়া? অতএব আমি যে তোমার পক্ষে মান্দ্রাজের পরিয়ার ন্যায় অস্পৃশ্য তাহাতে সন্দেহ কি?

আর বেশী লিখিব না; তুমি যে এই পর্য্যন্ত পড়িতে পড়িতেই

আমার উপর রাগে জ্বলিয়া উঠিয়াছ, ইহা অনুমান করিলে অসঙ্গত হইবে না। তবে তোমার সঙ্গে একটা আপোষের প্রস্তাব আছে—স্বীকার করিবে কি? আমি ছয় মাসের মধ্যে বাড়ীতে পড়িয়া ইংরেজীর প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করিতে সম্মত আছি; তবে সর্ত্ত এই যে তোমাকেও ঐ কালের মধ্যে ঐরূপ ভাবে সংস্কৃতের আদ্য পরীক্ষায় পাশ করিতে হইবে। কেমন—এই বন্দোবস্তে রাজী আছ কি? তুমিও আমাকে মনের মত করিয়া গড়িয়া লও, আমিও তোমাকে তাই করি—ঝগড়ার আর কোন কারণই থাকিবে না।

পত্র ইহারই মধ্যে দীর্ঘ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং শেষ না করিয়া আর উপায় কি? একটা কথা বাকী রহিয়া যাইতেছে, কিন্তু তোমাকে কোন অনুরোধ করিলে তুমি তাহা শুনিবে কেন? তোমাকে বাড়ী আসিতে বলার দুঃসাহস আমার নাই; আরও কিছুদিন এমনি ভাবে নির্জ্জনবাস কর—তখন পাগলা গারদে যাইতে পারিলে যে একটা মস্ত শান্তি অনুভব করিবে, একথা শপথ করিয়া বলিলেও বোধ হয় অন্যায় হইবে না। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি—

তোমারই দাসী

প্রতিভা—

পত্র পড়িয়া বুঝিলাম যে আমার শীঘ্র বাড়ী যাওয়া খুব দরকার, এবং প্রতিভার পত্র বউদিদিরই দ্বিতীয় আদেশ মাত্র। সুতরাং আর বিলম্ব না করিয়া আমি এক সপ্তাহের ছুটীর জন্য দরখাস্ত করিয়া দিলাম।

*　　　*　　　*

যথাসময়ে আমি বাড়ীতে যাইয়া মাতৃচরণে প্রণাম করিলাম। মা, বউদিদি এবং বাড়ীর আর আর সকলে আমার আগমনে বিশেষ সুখী হইলেন। সমস্ত দিন আমোদে-আহ্লাদেই কাটিয়া গেল।

রাত্রিতে আহারান্তে আমি আমার গৃহে যাইয়া শয়ন করিলাম। বউদিদি একটু পরে আসিয়া আমাকে বলিয়া গেলেন,—"তুমি আজ রাত্রে জাগ্রত অবস্থায় অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিবে; —গৃহের দরজা খোলা রাখিও।" আমি বউদিদির আদেশ অনুসারে গৃহের দরজা ভিজাইয়া দিয়া শুইয়া শুইয়া একখানা খবরের কাগজ লইয়া পড়িতে লাগিলাম। পড়িতে পড়িতে আমার একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল, এমন সময় দ্বারের কাছে কাহার পদশব্দ হইল। চক্ষু চাহিয়াই বোধ হইল যেন কোন অপূর্ব্ব রূপ-জ্যোতিঃসম্পন্না স্বর্গীয়া দেবকন্যা আমার গৃহে প্রবেশ করিতেছে। পরক্ষণেই তন্দ্রার ঘোর কাটিয়া গেলে বুঝিলাম যে

তিনি দেববালা বা পরিকন্যা নহেন, আমারই কিশোরী পত্নী প্রতিভা। আমি একদৃষ্টে সেইদিকে চাহিয়া রহিলাম—চাহিয়া চাহিয়া তাহার অতুলনীয় রূপরাশি দেখিতে লাগিলাম। প্রতিভা গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া আসিয়া আমার পদপ্রান্তে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। আমি আর থাকিতে পারিলাম না ;—উঠিয়া প্রতিভাকে আমার বাহু-বন্ধনে আবদ্ধ করিলাম, তারপর—আমি মিথ্যা কথা বলিতে পারিব না—তাহার সেই নবনীত কোমল রাঙা গাল দুইটীর উপরে আস্তে আস্তে দুইটী চুম্বনরেখা অঙ্কিত করিয়া দিলাম। তারপর তাহাকে টানিয়া লইয়া আসিয়া আমার খাটের উপর উপবেশন করিলাম। প্রতিভা কোন কথা বলিতে পারিল না, কেবল আমার বক্ষঃস্থলে মুখ লুকাইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নিরবে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। আমিও যে তাহার সঙ্গে সঙ্গে দুই চারি ফোঁটা চোখের জল না ফেলিয়াছিলাম, তাহা কে বলিতে পারে? উভয়ের হৃদয়ের ভার কতকটা লঘু হইলে আমি তাহাকে বলিলাম,—"প্রতিভা! ফুলশয্যার রাত্রে আমি তোমার সহিত সদ্ব্যবহার না করিয়া তোমাকেও যৎপরোনাস্তি কষ্ট দিয়াছি, নিজেও যার পর নাই ক্লেশ পাইয়াছি, সেজন্য আমি অতিমাত্র দুঃখিত। আমার অপরাধ হইয়াছে—আমায় ক্ষমা কর।" এবার প্রতিভা কথা কহিল,—বলিল,

কিসের ক্ষমা প্রাণনাথ ?” “তুমি আমার দেবতা, তুমি আমায় এমন কথা বলিলে আমার প্রাণে বড় আঘাত লাগিবে।”

তারপর দুইজনে সুখদুঃখের আরও কত কথাই হইল, সে গল্পের আর যেন শেষ হয় না।

*　　　*　　　*

সকালে উঠিয়া বউদিদি আমার প্রসন্নমুখ দেখিয়া বুঝিলেন যে, তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—“কেমন ঠাকুর-পো! কালরাত্রে কোন স্বপ্ন দেখিয়াছ কি না ?” আমিও হাসিয়া বলিলাম, “কাল রাত্রে জাগ্রতে যে স্বপ্ন দেখিয়াছি তাহা অপূর্ব্ব। সকলই আপনার আশীর্ব্বাদ।” বলিয়া তাঁহার পদধূলি মাথায় লইলাম। বউদিদি পুনরায় বলিলেন, “তাহা হইলে তোমার ইংরেজীর নেশা কাটিয়া গিয়াছে ?” আমি বলিলাম,—“বউদিদি! আর কেন, ঘাট হইয়াছে, মাপ করুন।” বউদিদি পুনরায় বলিলেন,—“মাপ—বাবা—তোমাকে বড় কঠিন রোগে ধরিয়াছিল, ভাগ্যে অল্পেই ঔষধ পড়িয়াছে, কিন্তু মনে রেখো এ বড় বিষম রোগ—অমৃতে অরুচি।” আমি বলিলাম, “আপনার শ্রীচরণের আশীর্ব্বাদে সে অরুচি এখন সারিয়া গিয়াছে, বলিয়া পুনরায় তাঁহার পদধূলি মাথায় লইলাম।

# পূজার অর্ঘ্য

## পল্লী বিরাগ

### প্রথম পরিচ্ছেদ

শৈশবেই শৈলেন্দ্রনাথের পিতৃবিয়োগ হইলে তাহার জ্যেষ্ঠ সহোদর জগদীশচন্দ্র তাহাকে বুকে-পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছিলেন। জগদীশচন্দ্রের আর্থিক অবস্থা বড় ভাল ছিল না। তিনি গ্রাম্য জমিদারের অধীনে যৎসামান্য বেতনের একটী চাকুরী করিতেন, তা ছাড়া কয়েক বিঘা জোত ও ব্রহ্মোত্তর ছিল, এই উভয় প্রকারের আয় হইতে তিনি অতিকষ্টে সংসারের খরচপত্র চালাইয়া লইয়া যাইতেন। তারপর শৈলেন্দ্রের বয়স যখন আট বৎসর, সেই সময় তাহার মাও হঠাৎ একদিনের জ্বরে নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে নশ্বর দেহ ত্যাগ করিলেন। মরিবার কালে তিনি শৈলেন্দ্রকে তাঁহার পুত্রবধূ—জগদীশচন্দ্রের স্ত্রী সৌদামিনীর হাতে হাতে সঁপিয়া দিয়া গেলেন। মাতৃবিয়োগে জগদীশচন্দ্র সংসার অন্ধকার দেখিলেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সবই সহিয়া যায়;

জগদীশচন্দ্রকেও পুনরায় কাজকর্ম্মে মন দিতে হইল। তিনি কিন্তু অর্থাভাবে মাতার শ্রাদ্ধাদি কার্য্য একাদশ দিনে শেষ করিতে পারিলেন না। যাহা হউক, অনেক কষ্টে তিনি কতকগুলি পৈতৃক বাসন ও কয়েকখানা মূল্যবান কাপড় বিক্রয় করিয়া কয়েকটী টাকা সংগ্রহ করিলেন, এবং তাহাই দিয়া ত্রিপক্ষ অন্তে মার শ্রাদ্ধক্রিয়া অতি সংক্ষেপে সরিয়া লইলেন শ্রাদ্ধের হাঙ্গাম মিটিয়া গেলে শৈলেন্দ্রনাথই তাঁহার ধ্যান জ্ঞান হইয়া উঠিল; এই পিতৃমাতৃহীন ভাইটীর প্রতি তিনি হৃদয়ের সবখানি মায়া-মমতা ঢালিয়া দিতে লাগিলেন। জগদীশ-চন্দ্র মনে করিলেন যে, তাঁহার নিজের অবস্থা যেমনই হউক না কেন, শৈলেন্দ্রনাথকে লিখাপড়া শিখাইয়া তিনি একটা মানুষের মত মানুষ করিয়া তুলিবেন, এবং কালে হয়ত তাহার দ্বারা সংসারের এই ঘোর অসচ্ছলতা কতকটা নিবারিত হইতে পারিবে। এই মনে করিয়া শৈলেন্দ্রের পাঠশালার শিক্ষা শেষ হইলে তিনি তাহাকে শক্তিপুরের উচ্চ ইংরাজী স্কুলে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলেন। জগদীশচন্দ্রের মাসে মাসে যাহা আয়, তাহাতে সংসারের সকল খরচ চালাইয়া শৈলেন্দ্রের স্কুলের বেতন দেওয়া তাঁহার সাধ্যায়ত্ত নহে। সুতরাং তিনি হেড্‌মাষ্টার যোগেন্দ্রবাবুকে ধরিয়া অনেক কাঁদাকাটি করিয়া শৈলেন্দ্রের স্কুল ফ্রী করিয়া লইলেন। এইরূপে

কয়েক বৎসর যথারীতি পড়া শেষ করিয়া শৈলেন্দ্রনাথ দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইল। এণ্ট্রান্স পরীক্ষার যত পাঠ্য হউক, এবার তাহাকে সে সমস্তই কিনিতে হইবে। জগদীশচন্দ্র মহা ভাবনায় পতিত হইলেন; শৈলেন্দ্রকে এতগুলি বই তিনি কোথা হইতে কিনিয়া দিবেন? অনেক চেষ্টা-চরিত্র করিয়া জগদীশচন্দ্র দুই চারিখানা পুরাতন পুস্তক সংগ্রহ করিলেন এবং অবশিষ্টগুলি তিনি তাঁহার খাইবার ধান হইতে এক বিশ বিক্রয় করিয়া তাহারই দ্বারা কিনিয়া দিলেন। শৈলেন্দ্রনাথের সমস্ত বইগুলি যখন সংগ্রহ হইল, তখন জগদীশচন্দ্রের আর আনন্দের অবধি রহিল না।

ইহার দুই বৎসর পরে শৈলেন্দ্র প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইল। প্রাথমিক টেষ্ট পরীক্ষায় সে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিলে জগদীশচন্দ্র ও তাঁহার পত্নীর আর আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না। কিন্তু পরদিন যখন শৈলেন্দ্রনাথ স্কুলে যাইবার সময় ফিস্ দাখিল করিবার টাকা চাহিল, তখন জগদীশ-চন্দ্রকে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িতে হইল। এককালীন্ দশটাকা তিনি কোথা হইতে দিবেন; এবার জমীতে ভালরূপ ধান হয় নাই, যাহা হইয়াছে তাহাদ্বারা তিন মাসের বেশী খোরাক কিছুতেই চলিবে না। ইহার মধ্য হইতে যদি আবার বিক্রয়

করিতে হয়, তাহা হইলে অন্নাভাবে মারা পড়িতে হইবে। ভাবিয়া-চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া অবশেষে তিনি পত্নী সৌদামিনীর মুখের দিকে চাহিলেন;—বলিলেন, কি করিয়া শৈলেনের ফিসের টাকা দিই ব'ল। সৌদামিনী অন্য কোন উপায় না দেখিয়া তাঁহার একমাত্র সোনার গহনা বাজুখানি হাসিমুখে স্বামীর হাতে দিয়া বলিলেন,—ইহাই বন্ধক রাখিয়া টাকা লইয়া আইস। ঠাকুরপো চাকুরী করিয়া যখন দু'পয়সা আনিতে শিখিবে, তখন আমাদের এ দুঃখ-দুর্দ্দশা অবশ্যই দূর হইবে। পত্নীর এই একমাত্র সোণার গহনাখানি বন্ধক রাখিলে যে সহজে তিনি উহা ছাড়াইয়া লইতে পারিবেন, এ আশা জগদীশচন্দ্রের কিছুমাত্র ছিল না। এদিকে শৈলেন্দ্রের ফিসের টাকাও না দিলে নয়। অগত্যা জগদীশচন্দ্র চক্ষু মুছিতে মুছিতে যাইয়া প্রতিবাসী কাশীনাথ শিকদারের নিকট গহনাখানি বন্ধক রাখিয়া দশটী টাকা ধার লইয়া আসিলেন, এবং তাহারই দ্বারা শৈলেন্দ্রের ফিসের টাকা প্রদান করিলেন। অতঃপর যথাসময়ে দিনাজপুরে যাইয়া শৈলেন্দ্রনাথ পরীক্ষা দিয়া আসিল।

যথাসময়ে সংবাদপত্রে পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইল;—শৈলেন্দ্রনাথ প্রথম বিভাগ উত্তীর্ণ হইয়াছে। ইহার প্রায়

একমাস পূর্ব্ব হইতে জগদীশচন্দ্র পরীক্ষার ফল জানিবার জন্য অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়াছিলেন, এবং প্রত্যহ ডাক আসিবার এক ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতে ডাকঘরে যাইয়া বসিয়া থাকিতেন। অবশেষে যে দিন পরীক্ষার ফল বাহির হইল, সেদিন আর তাঁহার আনন্দ ধরে না। তাঁহার পরম স্নেহের শৈলেন্দ্রনাথ যে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে, একথা তিনি প্রতি বাড়ীতে যাইয়া বলিয়া আসিলেন। তারপর মহা ধূমধামে সেদিন তিনি গৃহদেবতা জয়দুর্গা মাতার ভোগ দিলেন, এবং পাড়াস্থ ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া প্রসাদ খাওয়াইলেন।

এফ, এ পড়িবার জন্য জগদীশচন্দ্র শৈলেন্দ্রকে রাজসাহী কলেজে রাখিয়া দিলেন। শৈলেন্দ্রের খরচ-পত্রের কিয়দংশ গ্রাম্য জমিদার বাবু বহন করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন; অবশিষ্টাংশ তিনি তাঁহার সংসারের অনেকগুলি আবশ্যক খরচ কমাইয়া তাহা হইতে প্রদান করিতে লাগিলেন।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শৈলেন্দ্রনাথ এফ্, এ, পরীক্ষায় কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া মাসিক পঁচিশ টাকা হারে বৃত্তি পাইল। জগদীশচন্দ্র এই উপলক্ষে পূর্ব্বের ন্যায় মহাধুমধামে গৃহ-দেবতার ভোগ দিয়া গ্রামস্থ সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইলেন। তারপর তিনি শৈলেন্দ্রনাথকে বি, এ, পড়িবার জন্য কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে রাখিয়া দিলেন।

শৈলেন্দ্রনাথের এফ্, এ, পাশ করিবার পর নানাস্থান হইতে তাহার বিবাহের সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। পাঠদ্দশায় শৈলেন্দ্রের বিবাহ হয়, জগদীশচন্দ্রের এরূপ ইচ্ছা আদৌ ছিল না, সুতরাং তিনি সকল সম্বন্ধই প্রত্যাখান করিতে লাগিলেন। কিন্তু জগদীশচন্দ্রের পত্নী সৌদামিনীর কি জেদ হইল, তিনি শৈলেন্দ্রনাথের বিবাহ না দিয়া কিছুতেই ছাড়িবেন না। সৌদামিনী বলিতে লাগিলেন যে, এতদিন তিনি একাকীই ঘর-সংসার করিয়া আসিতেছেন; এক্ষণে শৈলেন্দ্রের একটি চাঁদপানা বউ ঘরে আনিয়া তাহারই হাতে সংসারের সমুদয় ভার দিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইবেন। এদিকে এফ্, এ, পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করায় শৈলেন্দ্রের

যশোঃসৌরভে চারিদিক আমোদিত হইয়াছিল। বহু সম্ভ্রান্ত ও বিদ্বান ব্যক্তি এই সময় শৈলেন্দ্রনাথকে কন্যাদান করিবার জন্য অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়াছিলেন। অনেককে ফিরাইয়া দিয়া অবশেষে জগদীশচন্দ্র সৌদামিনীর আগ্রহাতিশয্যে মহাদেবপুরের জমিদার যাদববাবুর একমাত্র কন্যা শ্রীমতী হেমাঙ্গিনীর সহিত শৈলেন্দ্রের বিবাহ স্থির করিলেন।

যথাসময়ে শৈলেন্দ্রের শুভ-বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইল। জগদীশচন্দ্র দরিদ্র হইলেও তাঁহার উপযুক্ত ভ্রাতার বিবাহে এক কপর্দ্দকও পণ গ্রহণ করিলেন না। তবে জমিদার যাদববাবু কন্যা জামাতাকে বহুমূল্যের যৌতুক দ্রব্য উপহার প্রদান করিলেন। বিবাহান্তে শৈলেন্দ্রনাথ যখন নববধূকে লইয়া ঘরে আসিল, তখন সৌদামিনীর আর আনন্দ ধরে না। তিনি তাঁহার পরম স্নেহের ঠাকুরপোটীর একটী চাঁদপানা বউ ঘরে পাইয়া তাহাকে কোলে করিয়া প্রতিবাসিনীদিগের সম্মুখে কতবার যে প্রাঙ্গণে নৃত্য করিলেন, তাহার আর ইয়ত্তা করা যায় না। তাঁরপর ফুলশয্যার রাত্রে সৌদামিনী এত অধিক ফুল দিয়া শৈলেন্দ্রের শয্যাখানি সাজাইলেন যে, সে যখন প্রথম সেঘরে প্রবেশ করিল, তখন তাহার মনে হইল যেন কোন রমণীয় উপবনের মধ্যে বিচরণ করিতেছে। বাস্তবিক শৈলেন্দ্রের

একটি চাঁদপানা বউ হওয়াতে সৌদামিনী যেমন অত্যধিক আহ্লাদিত হইয়াছিলেন, এমন আর বোধ হয় কেহই হন নাই।

কয়েক দিন ধরিয়া অবিশ্রান্ত আনন্দ উৎসব চলিল। অষ্টাহ পরে নববধূ পিত্রালয়ে গমন করিল; শৈলেন্দ্রনাথও বাড়ীর সকলের নিকট বিদায় লইয়া কলিকাতা রওনা হইল।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পূজার পূর্ব্বে জগদীশচন্দ্র শৈলেন্দ্রের শ্বশুর যাদববাবুকে লিখিলেন,—"বিবাহের পর আর বৌমাকে এখানে আনা হয় নাই। শ্রীমান্ শৈলেন্দ্র ৺পূজার সময় বাড়ী আসিতেছে, সেই সময়ে বৌমাকে আমরা আনিতে ইচ্ছা করি। আপনার যদি অমত না হয়, তাহা হইলে লিখিবেন। আপনার পত্র পাইলে লোক পাঠাইবার ব্যবস্থা করা যাইবে।" ইহার প্রত্যুত্তরে যাদববাবু লিখিলেন:—

"মহামহিমেষু

আপনার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। আপনি শ্রীমতীকে ৺পূজার সময় তথায় লইয়া যাইবার ইচ্ছা করিয়াছেন। তদুত্তরে

আমার বক্তব্য এই যে, এক্ষণে আপনাদের সংসারে আপনার স্ত্রী ভিন্ন গৃহিণী স্থানীয় অপর কেহই নাই। এরূপ অবস্থায় শ্রীমতীর যতদিন পর্য্যন্ত নিজের সংসার বুঝিয়া লইবার বয়স না হইতেছে, ততদিন তাহাকে তথায় পাঠান আমি সঙ্গত মনে করি না। আশা করি মহাশয় ইহাতে অসন্তুষ্ট হইবেন না। আর শ্রীমান জামাতা বাবাজীও যাহাতে অসন্তুষ্ট না হয়, তজ্জন্য তাহাকে পূজার সময় এখানে আনিবার ব্যবস্থা করা যাইবে।

নিবেদন ইতি।

নিঃ শ্রীযাদবচন্দ্র সেনগুপ্ত।"

এই অপ্রত্যাশিত উত্তর পাইয়া জগদীশচন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া গেলেন; যাদববাবু যে তাঁহার সহিত এমন ব্যবহার করিবেন, তাহা তিনি কখন স্বপ্নেও মনে করিতে পারেন নাই। যাহা হউক তখনই জগদীশচন্দ্র বাড়ীর মধ্যে যাইয়া সৌদামিনীর হাতে পত্রখানি দিয়া বলিলেন,—"এই দেখ, বেহাই কি লিখিয়াছেন।" সৌদামিনী সাগ্রহে পত্রখানি খুলিয়া পাঠ করিলেন; পাঠ করিয়া তাঁহার মুখখানা পাংশুবর্ণ হইয়া গেল তিনি জগদীশচন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "একি সত্যই বেহাইএর লেখা? তিনি কি এমন পত্র লিখিতে পারেন?" জগদীশচন্দ্র বলিলেন,— "যখন লিখিয়াছেন, তখন আর কেমন করিয়া বলি যে, তিনি

লিখিতে পারেন না।" শুনিয়া সৌদামিনার মুখখানি এতটুকু হইয়া গেল। তিনি বড় দুঃখে বলিলেন ;—"এই জন্যই কি ঠাকুরপোর বিবাহ দিয়াছিলাম? আমি না বড় আশা করিয়াছিলাম যে, ঠাকুরপোর বৌকে লইয়া দুই যা'তে মিলিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করিব?" জগদীশচন্দ্র বলিলেন,—"কেবল তোমারই পীড়াপীড়িতে আমি এ সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিলাম ; নতুবা জমিদারের মেয়েকে ঘরে আনিতে আমার কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না।" সৌদামিনী বলিলেন,—"কে জানিত এমন হইবে? আমার মামার বাড়ীর মেয়ে, দেখিতে বড়ই সুন্দরী বলিয়া আমার পছন্দ হইয়াছিল। তা আমারই পোড়া কপাল, আর কার দোষ দিব বল?"

ইহার কয়েক দিন পরে শৈলেন্দ্রনাথ পূজার ছুটীতে বাড়ী আসিল। সৌদামিনী বৈবাহিকের পত্রখানি তাহাকে দেখাইলেন। শৈলেন্দ্র পত্র পড়িয়া তাহার শ্বশুরের প্রতি যার পর নাই রুষ্ট হইল। বলিল,—"আপনারা এত দিন ইহার জবাব দিয়া দেন নাই কেন? লিখিয়া দিন যে যদি তাহাকে না আসিতে দেওয়া হয়, তবে আমরা অন্য বিবাহ করিবার ব্যবস্থা করিব। আর আমিও এত নিলর্জ্জ নহি যে "তু" করিয়া ডাকিলেই অমনি শ্বশুর বাড়ীতে দৌড়িব।" জগদীশচন্দ্র পত্রের জবাব দিয়া দিলেন বটে, কিন্তু

ঙরূপ ভাবে নহে। তিনি লিখিলেন,—"আপনার পত্র পাইলাম : যাহা অভিরুচি হয় করিবেন। শ্রীমান শৈলেন্দ্র আপনাদের ওখানে যাইতে প্রস্তুত নয়। ইতি।" যাদববাবু এই পত্রের আর কোন উত্তর প্রদান করিলেন না। এদিকে পূজার ছুটী শেষ হওয়ায় পুনরায় শৈলেন্দ্রনাথ কলিকাতায় রওনা হইল।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

যথাসময়ে শৈলেন্দ্রনাথ প্রশংসার সহিত বি,-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন, এবং ইহার অল্পকাল পরেই গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ নিযুক্ত করিয়া পাটনার সদরে স্থাপন করিলেন।

পাটনায় অবস্থানকালে যাঁহাদের সহিত শৈলেন্দ্রনাথের আন্তরিক সৌহার্দ্দ্য জন্মিয়াছিল, শ্রীযুক্ত রঘুনাথ সরকার তাঁহাদিগের অন্যতম। রঘুনাথবাবু প্রথমে একটী রেলওয়ে আপিশে পঁচিশ টাকা বেতনের সামান্য একটী চাকুরী করিতেন, কিন্তু নানা কারণে চাকুরীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া অবশেষে যৎসামান্য মূলধন লইয়া পাটনায় একটি মনিহারী জিনিষের দোকান খুলিয়া ব্যবসা করিতে আরম্ভ করেন তাঁহার সততা ও অধ্যবসায় গুণে অতি অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার কারবার বিশেষ প্রতিষ্ঠা

লাভ করে। এইরূপে সফলকাম হইয়া রঘুনাথ বাবু তাঁহার ব্যবসায়ের অঙ্গস্বরূপ পাটনা হইতে বাংলা ভাষায় একখানি দৈনিক সংবাদপত্র বাহির করিতে আরম্ভ করেন। সংবাদপত্র বাহির করিবার পর হইতে তাঁহার কাজকারবার এতদূর প্রসার লাভ করে যে, আজকাল তাঁহার দোকান বিহার প্রদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দোকান বলিয়া পরিগণিত হয়। এই রঘুনাথ বাবুরই একান্ত আগ্রহাতিশয্যে শৈলেন্দ্রনাথ অবশেষে তাঁহার স্ত্রীকে পাটনায় আনিতে স্বীকৃত হইলেন।

শৈলেন্দ্রনাথ এবিষয়ে জগদীশচন্দ্রের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে পত্র লিখিলেন। জগদীশচন্দ্র প্রত্যুত্তরে তাহাকে লিখিলেন,—"তুমি বৌমাকে তোমার কাছে লইয়া যাইবে, ইহা অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি হইতে পারে? আমার ইহাতে কিছুমাত্র আপত্তি নাই।" ইহার অতি অল্পকাল পরেই শৈলেন্দ্রনাথ তাঁহার পত্নীকে পাটনার বাসায় আনয়ন করিলেন।

এই ঘটনার সামান্য কিছুকাল পরেই শৈলেন্দ্রের শ্বশুর যাদববাবু ইহলোক ত্যাগ করিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি তাঁহার পঞ্চাশ হাজার টাকা মূল্যের সমুদয় সম্পত্তি কন্যা্মাতার নামে লিখিয়া দিয়া গেলেন। যাদববাবুর মৃত্যুর পরে শৈলেন্দ্রনাথই তাঁহার সমুদয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলেন।

সেই বৎসর পূজার পূর্ব্বে শৈলেন্দ্রনাথ তাঁহার অগ্রজের নিকট হইতে নিম্ন লিখিত পত্রখানি পাইলেন।

শ্রীশ্রীদুর্গা

শরণম্

পরম স্নেহাস্পদেষু।

আশীর্ব্বাদ জানিবে। এবার বাড়ীতে মার পূজা করিব স্থির করিয়াছি। পিতৃদেবের স্বর্গারোহণের পর হইতে মার বাৎসরিক পূজা বন্ধ হইয়াছিল, এবার আবার চণ্ডীমণ্ডপ মার আগমনে পূর্ব্বের ন্যায় হাসিবে। তুমি শ্রীমতী বধূমাতাকে সঙ্গে লইয়া পূজার ছুটিতে বাড়ী আসিবে। ছেলে মানুষী করিয়া এ সময় অন্য কোথাও যাইও না। অত্রস্থ কুশল; তোমাদের মঙ্গল সংবাদ লিখিয়া সুখী করিবে। ইতি

আশীর্ব্বাদক শ্রীজগদীশচন্দ্র সেনগুপ্ত

দুর্গাপুর।

যথাসময়ে শৈলেন্দ্রনাথ তাঁহার জ্যেষ্ঠের পত্রের বিষয় পত্নী হেমাঙ্গিনীকে জানাইলেন। প্রত্যুত্তরে হেমাঙ্গিনী বলিলেন, "এসময়ে তোমাদের গ্রামে যে রকম অতিরিক্ত ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব, তাহাতে আমি কিছুতেই সেখানে যাইতে পারিব না। চারি দিকে পাট পচান জল, তাহারি মধ্যে তোমাদের বাড়ীখানি।

তোমার ইচ্ছা হয় সেখানে যাইতে পার, আমি কিন্তু কোথায়ও যাইব না।" শৈলেন্দ্রনাথ আর কি করেন, অগত্যা তাঁহার অগ্রজকে লিখিয়া দিলেন, "এবার পূজার ছুটিতে গবর্ণমেণ্ট আমার প্রতি একটী বিশেষ কার্য্যের ভারার্পণ করিয়াছেন, তাই সে কাজ ফেলিয়া আমার বাড়ী যাওয়া ঘটিবে না, ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি।"

শৈলেন্দ্রনাথের এই পত্র পাইয়া জগদীশচন্দ্র ও সৌদামিনী মরমে মরিয়া গেলেন। বড় দুঃখে সৌদামিনী বলিলেন, "যাকে এতকাল বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছিলাম, সেই আজি এমন পর হইয়া গেল? ও ছাই লেখা পড়া যদি তাহাকে না শিখাইতাম, তাহা হইলে আজ আমাদের বুকে এমন কঠিন শেলাঘাত কখনই হইত না। দেশে কি মানুষ নাই যে, এই রাক্ষসী শিক্ষা হইতে আমাদের দেশের ছেলেগুলোকে বাঁচায়?"

এ দিকে পূজার ছুটীতে শৈলেন্দ্রনাথের আদালত বন্ধ হইলে হেমাঙ্গিনী বলিলেন, "চল এই সময় একবার আগরা ও মথুরা প্রভৃতি দেখিয়া আসা যাউক। বিশেষ আগরার তাজমহল দেখিবার আমার বড়ই ইচ্ছা রহিয়াছে।" শৈলেন্দ্রনাথ প্রথমে কিছু ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে সম্মত হইলেন—উভয়ে পশ্চিম ভ্রমণার্থে পাটনা হইতে রওনা হইলেন।

# পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ছুটীর কয়দিন দেশ ভ্রমণে অতিবাহিত করিয়া শৈলেন্দ্রনাথ স্ত্রীর সহিত পুনরায় পাটনায় ফিরিয়া আসিলেন। হেমাঙ্গিনী এইবার জেদ ধরিয়া বসিলেন যে, দুর্গাপুরের জলহাওয়া যেরূপ কদর্য্য তাহাতে সেস্থানে ত তিনি জীবনে কখন পদার্পণ করিবেন না। সুতরাং রাঁচী বা সিমুলতলার ন্যায় স্বাস্থ্যকর স্থানে একটা বাড়ী করা অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। কথাটা শৈলেন্দ্রেরও একেবারে অসঙ্গত বোধ হইল না, কিন্তু তাই বলিয়া বাংলাদেশের বাহিরে আসিয়া বাড়ী করাও তিনি সঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন না। যাহা হউক অনেক জল্পনা-কল্পনায় পর অবশেষে কলিকাতার ভবানীপুরে একখানি বাড়ী করিতে তিনি কৃতসংকল্প হইলেন।

শৈলেন্দ্রনাথ এখন তাঁহার শ্বশুরের বিশাল জমিদারীর একমাত্র অধিকারী, সুতরাং অর্থের অভাব তাঁহার কিছু মাত্র ছিল না। অল্পকাল মধ্যেই তিনি ভবানীপুরে একখানি প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা ক্রয় করিলেন, এবং অবকাশ কালে সস্ত্রীক সেই স্থানে যাইয়া বাস করিবার সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া রাখিলেন।

## পূজার অর্ঘ্য

এদিকে পুনরায় শারদীয়া পূজা সমাগত হইল। পূজার প্রায় এক পক্ষ পূর্ব্বে শৈলেন্দ্রনাথ তাঁহার বৌদিদির নিকট হইতে নিম্নলিখিত পত্র খানি পাইলেন।

পরম স্নেহাস্পদেষু।—

স্নেহের ঠাকুর-পো,

দীর্ঘকাল হইল বাটীতে তোমার কোন পত্র আসে নাই; তজ্জন্য আমরা যার পর নাই উৎকণ্ঠায় দিনপাত করিতেছি। যাহা হউক, ফেরৎ ডাকে তোমার ও ভগ্নী হেমাঙ্গিনীর কুশল-সংবাদ লিখিয়া সুখী ও নিশ্চিন্ত করিবে।

তারপর গত বৎসর তুমি পূজার সময় বাড়ী আইস নাই; তজ্জন্য আমাদিগকে যে কিরূপ মনোকষ্ট পাইতে হইয়াছে, তাহা তোমাকে এই সামান্য পত্রে কিরূপে বুঝাইব? স্বর্গীয় ঠাকুরের মৃত্যুর পর হইতে বাটীতে মার পূজা বন্ধ ছিল। গত বৎসর বড় আহ্লাদ করিয়া তোমার অগ্রজ মার পূজার উদ্যোগ করিয়াছিলেন; কিন্তু তুমি ছেলে মানুষী করিয়া বাড়ী না আসায় আমাদের সকল আনন্দ নিরানন্দে পরিণত হইয়াছিল।

যাহা হউক, এবারও বাড়ীতে মার পূজা হইবে। তোমার কাছারী বন্ধ হইলে ভগ্নী হেমাঙ্গিনীকে সঙ্গে লইয়া সত্বর বাড়ী আসিবে—অন্যথা করিও না। তোমাকে আমি শৈশব কাল হইতে

বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছি। এক্ষণে তুমি উপযুক্ত হইয়াছ—তোমার বিবাহ দিয়া চাঁদপানা বউ আনিয়া দিয়াছি। কিন্তু আমার সে বড় সাধের বৌকে লইয়া আমি একটী দিনও ঘর-সংসার করিতে পাইলাম না। আমার এ দুঃখ রাখিবার স্থান নাই। তারপর যদি বৎসরান্তে পূজার সময় একটিবার বাড়ীতে না আইস, তাহা হইলে আক্ষেপের সীমা থাকিবে না। তাই আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ—এবার পূজার সময় ভগ্নীকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী আসিতেই হইবে।

সুশীল প্রত্যহ তোমার কথা জিজ্ঞাসা করে, আসিয়া আমার গলা ধরিয়া বলে,—"মা কাকা-বাবু বাড়ী আসেন না কেন; কাকী-মা কবে আস্‌বেন, আমি তাহার কথার কি উত্তর দিব ভাবিয়া পাই না। যেদিন বলি তিনি শীঘ্রই বাড়ী আসিবেন সেদিন তাহার বড়ই আনন্দ, যেদিন বলি তিনি এখন আসিবেন না সেদিন সে কাঁদিয়া কাঁদিয়া অনর্থ করে। তাহার জন্য কি তোমার কোনই কষ্ট হয় না? যাহা হউক, এবার পূজার সময় অবশ্য বাড়ী আসিও। অধিক আর কি লিখিব। আমরা শ্রীমান সহ সকলেই ভাল আছি। আশীর্ব্বাদি জানিবে।

ইতি—চিরশুভাকাঙ্ক্ষিণী
শ্রী সৌদামিনী গুপ্তা।

পত্রখানি পড়িয়া শৈলেন্দ্রনাথ বহুক্ষণ ধরিয়া মনে মনে কত কি চিন্তা করিলেন ; ক্রমে একে একে সমুদয় পূর্ব্বস্মৃতি আসিয়া তাঁহার মানস-পটে উদয় হইতে লাগিল। এইভাবে যখন তিনি চিন্তা-নিবিষ্ট ছিলেন, সেই সময় তাঁহার পত্নী হেমাঙ্গিনী অকস্মাৎ সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ; এবং শৈলেন্দ্রনাথকে অন্যমনস্ক দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে ? অমন হইয়া কি ভাবিতেছ ?" শৈলেন্দ্রনাথ যেন একটু থতমত খাইলেন ; সহসা কি উত্তর দিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। অবশেষে বলিলেন,—"না, কিছু না ; এই দেখ বউ দিদি এই চিঠি লিখিয়াছেন।" বলিয়া সৌদামিনীর পত্রখানা হেমাঙ্গিনীর হাতে অর্পণ করিলেন। হেমাঙ্গিনী পত্র পড়িয়া বলিলেন,—"তা ইহার জন্য এত ভাবনা কেন ? রান্না হইয়াছে, এখন স্নান করগে, পরে বিবেচনা করিয়া যাহা ভাল হয় করা যাইবে।" শৈলেন্দ্রনাথও আর কিছু না বলিয়া স্নানার্থে উঠিয়া গেলেন।

# ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বৈকালে শৈলেন্দ্রনাথ কাছারী হইতে ফিরিয়া আসিয়া হেমাঙ্গিনীকে বলিলেন, "বউদিদির পত্রের ত যাহা হয় একটা উত্তর দিতে হইবে ; কি স্থির করিলে বল ?"

হেমাঙ্গিনী মুখখানা ভারি করিয়া বলিলেন, "স্থির আর করিব কি ? অন্য সময় হইলে না হয় বা যাইতামও ; কিন্তু এই বর্ষাকালে ত আমি কিছুতেই সেখানে যাইব না। চারিদিকেই পাট পচান জল, দুর্গন্ধে বাড়ীতে তিষ্ঠানো অসাধ্য। তারপর সেই পাট পচান জলেই নাওয়া, সেই জলই আবার খাওয়া। ইহাতে লোকের স্বাস্থ্যই বা কি করিয়া টিকিতে পারে ? সেখানে কি আমি কেবল ব্যারামে ভুগিবার জন্য যাইব ? তোমার ইচ্ছা হয় যাইতে পার ; আমি না হয় একাই কলিকাতার বাসায় থাকিব। কিন্তু মনে থাকে যেন, সেখান থেকে যদি ম্যালেরিয়া নিয়ে আস, তবেই তোমার সঙ্গে আমার বুঝাপড়া আছে।"

শৈলেন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, "সোজা কথা বলিলেই হইত যে যাওয়া হইবে না, অত ভূমিকা করিবার কি আবশ্যক ছিল ?

বেশ তাহা হইলে আমি সেই কথাই লিখিয়া দিতেছি।” এই বলিয়া তিনি বসিবার ঘরে যাইয়া দোয়াত ও কাগজ-কলম লইয়া নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিলেন :—

শ্রীশ্রীচরণ কমলেষু—

স্নেহময়ী বউদিদি, আপনার আশীর্ব্বাদী পত্র পাইয়া যার-পর নাই সুখী হইলাম। পূজার সময় আমাদিগকে বাড়ী যাইবার জন্য লিখিয়াছেন, কিন্তু ম্যালেরিয়ার প্রকোপে আমাদের গ্রামের স্বাস্থ্য যেরূপ কদর্য্য হইয়াছে, তাহাতে বাড়ী যাইতে কিছুতেই ইচ্ছা করে না। আমার সহরে থাকিয়া থাকিয়া কেমন অভ্যাস হইয়া গিয়াছে; পাড়াগাঁ আর এখন মোটেই ভাল লাগে না। তারপর পাড়াগাঁয়ে থাকার অনেক দোষ; যত ছোটলোকের সঙ্গে সেখানে মিশিতে হয়। কলি-কাতায় থাকিলে দুপুর রাত্রেও যদি আপনি বাঘের চোখ চাহেন তবে পয়সা থাকিলে অনায়াসেই তাহা পাইতে পারেন। আর পাড়াগাঁয়ে? সেখানে কোন একটা জিনিষের দরকার হইলে যদি সহরে লোক পাঠান না যায়, তবে হাজার মাথা কুটিলেও তাহা পাইবার উপায় নাই। তারপর পাড়াগাঁয়ের রাস্তাঘাট ভাল নয়, পদে পদে বনজঙ্গল—জলকাদা ভাঙ্গিতে হয়; এ সকল আর আমার ধাতে মোটেই সহ্য হয় না। বিশেষ ব্যারাম হইলে

যেখানে ডাক্তার কবিরাজ পাইবার উপায় নাই, ভদ্রলোকে সে স্থানে কি করিয়া থাকিতে পারে? এই সকল নানাবিধ অসুবিধার কথা মনে করিয়াই আমি বাড়ীতে যাওয়া সঙ্গত মনে করিলাম না। আপনার ভগ্নীও ঠিক্ আমারই মতো মত পোষণ করেন; সুতরাং তিনিও এই বর্ষাকালে বাড়ী যাইতে ইচ্ছা করেন না। যাহা হউক, সেজন্য মনঃক্ষুণ্ণ হইবেন না। পূজার পরে আপনাকে কলিকাতার বাসায় আনিয়া দেখাশুনার বন্দোবস্ত করিব ইতি

সেবক—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত,
পাটনা।

যথা সময়ে পত্রখানি ডাকে রওনা হইয়া গেল।

## সপ্তম পরিচ্ছেদ

যথাসময়ে সৌদামিনী শৈলেন্দ্রের লিখিত পত্রখানি পাইলেন। পত্র পড়িয়া যে তিনি কি পরিমাণ ব্যথিত হইলেন, তাহা আমরা এই ক্ষুদ্র লেখনী সাহায্যে বর্ণনা করিতে অক্ষম। তাঁহার পরম স্নেহের শৈলেন্দ্রনাথ—যাকে তিনি বুকে করিয়া নিজের সন্তানের ন্যায় মানুষ করিয়াছিলেন—সেই শৈলেন্দ্রনাথ যে তাঁহাকে এমন করিয়া পত্র লিখিতে পারে, তাহা তিনি কখন স্বপ্নেও মনে করিতে পারেন নাই। একান্ত বিষাদভরে তিনি পত্রখানি জগদীশচন্দ্রের হাতে দিয়া বলিলেন,—"এই দেখ, ঠাকুরপো কি চিঠি লিখিয়াছে। আহা, তাকে আমি বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছিলাম। তারপর সে উপযুক্ত হইল, আমি বড় সাধ করিয়া তাহার বিবাহ দিলাম। সেই ঠাকুরপো কি না আমার একটা অনুরোধ রাখিতে পারিল না।" জগদীশচন্দ্র পত্রখানি বেশ করিয়া পড়িলেন; পড়িয়া তিনি বলিলেন,—"এজন্য আর কার দোষ দিব বল; সবই আমাদের অদৃষ্টের দোষ। সেই শৈলেন্দ্রনাথ—নিজে না খাইয়া যাকে খরচ দিয়া স্কুলে পড়াইলাম

তার এনট্রান্স্ পরীক্ষার সময় তোমার একমাত্র গহনা বাজুখানি বন্ধক রাখিয়া তাহার ফিশের টাকা দিলাম—সেই শৈলেন্দ্রনাথ কিনা লেখাপড়া শিখিয়া এমন অকৃতজ্ঞ হইল? আক্ষেপ করিয়া কি করিবে বল?" সৌদামিনী আর কিছু বলিতে পারিলেন না, গৃহকার্য্যে উঠিয়া গেলেন।

সেইদিন রাত্রিতে আহারাদি শেষ করিয়া সৌদামিনী শৈলেন্দ্রনাথকে সুদীর্ঘ একখানি পত্র লিখিলেন। পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবারণের জন্য আমরা পত্রখানি অবিকল নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

শ্রীশ্রীদুর্গা

শরণম্।

স্নেহের ঠাকুরপো,

অত্র পত্রে আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে ও ভগ্নী হেমাঙ্গিনীকে জানাইবে।

তোমার পত্র পড়িয়া যে কতদূর ব্যথিত হইলাম, তাহা তোমাকে কেমন করিয়া বুঝাইব? পূজার সময় বাড়ীর ছেলে বাড়ীতে না আসিলে ভাল দেখায় না; তাই তোমাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া আসিবার জন্য পত্র লিখিয়াছিলাম; তা তুমি আমার সে অনুরোধ রক্ষা করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করিলে

না। এ জন্য আর কাহার দোষ দিব—সবই আমাদের দুর্ভাগ্য। তবে মনে বড় আক্ষেপ রহিয়া গেল। তোমাকে আমি বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছিলাম। তারপর তুমি বড় হইলে আমরা নিজে না খাইয়া তোমাকে খরচ দিয়া স্কুলে পড়াইতে লাগিলাম। তোমার এণ্ট্রান্স পরীক্ষার ফিসের টাকা দিবার সময়—যাক, সে কথায় আর কাজ কি?

তুমি লিখিয়াছ গ্রামের স্বাস্থ্য বড় কদর্য্য, এক্ষণে চারিদিকে পাট পচান জল; রাস্তা-ঘাট ভাল নহে, পদে পদে বন-জঙ্গল, জল কাদা ভাঙ্গিতে হয়, ব্যারামের সময় ডাক্তার কবিরাজ পাওয়া যায় না, তাই তুমি পূজার সময় বাড়ী আসিতে পারিবে না। যাহা হউক, অন্ততঃ দুই চারটী দিনের জন্যও তোমার জন্ম ভূমিতে পদার্পণ করিলে বোধ হয় বিধাতা তোমার প্রতি বিরূপ হইতেন না। আর কাহাদের দোষে বাংলার পল্লীগ্রামগুলির আজি এ দুরবস্থা হইয়াছে? একবাক্যে ইহার উত্তর পাইবে—ইহা গ্রামবাসীদের নিজেদেরই দোষের জন্য। জমিদার মহাশয় গ্রাম ছাড়িয়া বিলাসিতার লীলাভূমি কলিকাতায় যাইয়া বসবাস করেন। সেখানে অহরহঃ গাড়ীঘোড়া হাঁকাইতেছেন—আর দিন দিন উৎসন্ন যাইতেছেন। জমিদারীর কাজকর্ম্ম সবই চিঠির মারফতে সারিয়া লইতেছেন। এই দেখ আমাদের গ্রামের জমিদার রমেশ

বাবু, তিনিত গ্রাম ছাড়িয়া কলিকাতাতেই একেবারে চিরস্থায়ী ভাবে বাসা বাঁধিয়াছেন। এই কয় মাস হইল তিনি নেপ্‌লসের ভূমিকম্প পীড়িত লোকদের জন্য লক্ষ টাকা চাঁদা দিয়া বাহবা লইয়াছেন ; আর সেদিন এখানকার রামধন ভৌমিক সদরে প্রজাদের জলকষ্টের কথা বলিতে গিয়া—গ্রামে একটা পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠার প্রার্থনা জানাইতে গিয়া পেস্কার মহাশয়ের লাঠি খাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। বৎসরান্তে গ্রীষ্ম ঋতু আসিলে যখন দার্জ্জিলিং যাইবার আবশ্যক হয়, তখন দার্জ্জিলিংএর পথে একটী দিন, এবং সেখান হইতে ফিরিবার সময় আর একটী দিন মাত্র তিনি নিজের গ্রামে অতিবাহিত করেন, এই দুইটী দিন ছাড়া বৎসরের মধ্যে আর কখনই তিনি সেখানে পদার্পণ পর্য্যন্ত করেন না। এরূপ করিলে পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্য কোথা হইতে ভাল হইবে ? এই যে লক্ষ টাকা তিনি নেপল্‌সের লোকদের জন্য দান করিলেন, এই লক্ষ টাকা যদি তিনি তাঁহার জমিদারীর অধীন গ্রামগুলির জলকষ্ট নিবারণ ও রাস্তা-ঘাট ভাল করিবার জন্য খরচ করিতেন, তাহা হইলে আমাদের গ্রামের এমন দুরবস্থা হইত কি ? তবে শুধু জমিদারকে এজন্য দোষী করিলেও চলিবে না। গ্রামের মধ্যে যাঁহারা একটু লেখাপড়া শিখিয়া বড়দরের চাকুরী প্রভৃতি করেন, তাঁহারাও জন্মভূমির সঙ্গে সকল সম্বন্ধ

ছেদন করেন। যিনি যেখানে চাকুরী করেন, সেইখানেই তিনি বাড়ী করিয়া বসেন। এমন করিলে পল্লীগ্রামের এই শোচনীয় অবস্থা কিসে দূর হইবে? গ্রামের মধ্যে যাঁহারা একটু শিক্ষিত ও অর্থশালী, তাঁহারাই যদি উহার সঙ্গে সকল সম্বন্ধ ত্যাগ করেন, তবে দরিদ্র পল্লীবাসিগণ দাঁড়াইবে কোথায়? সুতরাং আমাদের দেশের জমিদার ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণের এই পল্লীবিরাগই যে বাংলার বর্ত্তমান দুর্দ্দশার প্রধান কারণ, যাঁদের ঘটে বিন্দুমাত্র বুদ্ধি আছে, তাঁহারা বোধ হয় ইহা কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

যাহা হউক, তোমাকে আমি কোন বিষয়ে দোষী করিতে চাহি না, সবই আমাদের গ্রহের ফের। বড় দুঃখে এতগুলি কথা লিখিলাম, সেজন্য মনে কিছু করিও না। মা মঙ্গলচণ্ডী তোমাকে কুশলে রাখুন, ইহাই তাঁর নিকট আমার একমাত্র প্রার্থনা। ইতি

আশীর্ব্বাদিকা শ্রীসৌদামিনী গুপ্তা

দুর্গাপুর।

যথা সময়ে পত্রখানি ডাকে রওনা হইয়া গেল।

* * * *

এদিকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে সৌদামিনীর পত্রখানি শৈলেন্দ্রের কাছে আসিয়া পৌছিল; শৈলেন্দ্র তখন গভীর মনোযোগের

সহিত এক এক করিয়া অনেকবার উহা পড়িলেন। পত্রখানি তাঁহার নিকট এমনই সুযুক্তিপূর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল যে, বার বার উহা পড়িয়াও তিনি পরিতৃপ্ত হইতে পারিলেন না। পত্রের একটী ফল এই হইল যে, শৈলেন্দ্রনাথ তাঁহার পূর্ব্ব আচরণের কথা মনে করিয়া যারপর নাই অনুতপ্ত হইলেন;—ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া তখনই তাঁহার বৌদিদিকে একখানি পত্র লিখিয়া দিলেন। তারপর পত্নী হেমাঙ্গিনীকে ডাকিয়া বলিলেন,—"এই দেখ, আবার বউদিদি পত্র লিখিয়াছেন; তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য—সোণার অক্ষরে লিখিয়া রাখার উপযুক্ত। সত্যই আমাদের এই পল্লী-বিরাগ বঙ্গের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার সর্ব্বপ্রধান কারণ আমি পূজার সময় নিশ্চই বাড়ী যাইব।" বলিয়া পত্রখানি হেমাঙ্গিনীর হস্তে অর্পণ করিলেন। হেমাঙ্গিনী পত্রখানি আগাগোড়া পড়িয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন,—"তোমার নিজের ঘটে যদি বিন্দুমাত্র বুদ্ধি থাকিত, তাহা হইলে কি আর যে যাহা বলে তাহাতেই নাচিয়া উঠিতে? দেশ উদ্ধারের ওসব লেক্‌চার কাগজে কলমেই ভাল দেখায়। এই ঘোর বর্ষাকালে পাড়াগাঁয়ে গিয়া দুদিন পরেই যখন লেপ মুড়ি দিতে হবে, তখন না মজাটা টের পাবে। তোমার আর কি, শয্যা নিলেই হ'ল। তারপর ঝোঁক সাম্‌লাবার বেলা তুই সাম্‌লা।

ওষুধে-পত্রে, ডাক্তারের ফীতে টাকার শ্রাদ্ধত হবেই; আর কাজ-কর্ম্মও যে কতদিন কামাই হ'বে তা কে জানে?" শৈলেন্দ্র বিষণ্ণ হইয়া বলিলেন,—"তাহা হইলে কি তোমার যাওয়ার মত নয়? আমি যে যাইব বলিয়া বৌদিদিকে পত্র লিখিয়া দিলাম।" হেমাঙ্গিনী আবার বলিলেন,—"তোমার যদি একান্তই ভুগবার ইচ্ছা থাকে, তবে যাওনা কেন; আমি তোমাকে মানা কর্‌বার কে? তবে এই সেদিন রোগ ভুগে উঠেছ; যদি শরীর শোধরাবার ইচ্ছা থাকে, তবে এই লম্বা ছুটীটা আবু পাহাড়ে কাটিয়ে এস; শরীর তো আগে সারুক, দেশ উদ্ধার না হয় পরেই কোরো।" বলা বাহুল্য শৈলেন্দ্রনাথের যে শিক্ষা দীক্ষা, তাহাতে তিনি আর মত পরিবর্ত্তন না করিয়া পারিলেন না। পূজার ছুটী হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা উভয়ে আবু পাহাড়ে যাত্রা করিলেন।

---

# পূজার অর্ঘ্য

## বিষাদ প্রতিমা

### প্রথম পরিচ্ছেদ

কাশীপ্রসাদ রায় মহাশয় মাধবপুর গ্রামে একজন বেশ গণ্যমান্য ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি। প্রতিবেশী যজ্ঞেশ্বর-বাবুর পুত্রের বিবাহে বরযাত্রী সাজিয়া সবেমাত্র তিনি গৃহের বাহির হইয়াছেন, এমন সময় তার ঘরের হরকরা আসিয়া তাঁহার হাতে একটী জরুরী টেলিগ্রাম দিয়া চলিয়া গেল। ব্যস্তসমস্ত হইয়া টেলিগ্রামের আবরণ ছিঁড়িয়া তিনি উহা পাঠ করিলেন। তাহাতে লিখিত ছিল,—"আপনার পুত্র বিধুভূষণ মৃত্যুশয্যায় শায়িত। অবিলম্বে আসিয়া দেখা করুন।"

ম্যানেজার প্রমথনাথ বোর্ডিং, রাজসাহী।

টেলিগ্রাম পড়িয়া রায় মহাশয়ের মাথা একেবারে ঘুরিয়া

গেল, তিনি কপালে হাত দিয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িলেন। কিন্তু তখন আর ভাবিবারও সময় ছিল না; রাজসাহী যাইবার ট্রেণ ষ্টেশনে তখন প্রায় আসিয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং তিনি আর বিবাহের বাড়ীতে না যাইয়া একেবারে ষ্টেশনের দিকে ছুটীলেন। পথে কনিষ্ঠ পুত্র বিমলেন্দুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল, তাহার দ্বারা বাড়ীতে এই খবর পাঠাইয়া দিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে তিনি ষ্টেশনে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার ষ্টেশনে আসিবার পূর্ব্বেই ট্রেণখানি আসিয়া পড়িয়াছিল; সুতরাং তিনি তাড়াতাড়ি একখানি টিকিট কিনিয়া গাড়ীতে চড়িতে না চড়িতেই গাড়ী খুলিয়া দিল। গাড়ীতে বসিয়া বসিয়া তিনি কেবল দুর্গা নাম জপ করিতে লাগিলেন।

যথাসময়ে রায় মহাশয় রাজসাহীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। প্রমথনাথ বোর্ডিং হাউসের দুই নম্বর ঘরে প্রবেশ করিতেই তিনি দেখিতে পাইলেন যে মেজের উপরে রোগশয্যায় তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিধুভূষণ শায়িত, এবং চারিদিকে কলেজের ছাত্র ও বিধুভূষণের বন্ধুগণ তাহার পরিচর্য্যা কার্য্যে নিযুক্ত। রায় মহাশয় বিপুল অর্থশালী ব্যক্তি। তিনি পুত্রের চিকিৎসার জন্ম চেষ্টা চরিত্র এবং অর্থ ব্যয়ের ত্রুটী করিলেন না। আর কলেজের ছাত্রগণ ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া গিয়া অক্লান্ত ভাবে

দিনরাত্রি তাহার যেরূপ সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিল, নিজের বাটীতে থাকিলেও তেমন সেবা-শুশ্রূষা হইত কি না সন্দেহ। কিন্তু কাহারও পরমায়ু না থাকিলে সহস্র চেষ্টাতেও তাহাকে বাঁচাইতে পারা যায় না। তিন দিন তিন রাত্রি এইভাবে কাটিবার পর অবশেষে মধুর চরিত বিধুভূষণ তাহার বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনকে অপার শোক-সাগরে ভাসাইয়া দুরন্ত বিসূচিকা রোগে ইহলোক ত্যাগ করিল।

আপনার প্রাণাধিক পুত্রকে পদ্মাসৈকতে বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়া রায় মহাশয় রাজসাহী হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার বাড়ী পৌঁছিবার বহু পূর্ব্বেই বিধুভূষণের মৃত্যু-সংবাদ গ্রামের সর্ব্বত্র দাবানলের ন্যায় প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল। এক্ষণে তাঁহার বাড়ী আসিবার সংবাদ শুনিয়া গ্রামস্থ সকলেই একে একে আসিয়া তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইল। তাহারা আসিয়া দেখিতে পাইল যে, রায় মহাশয় অসহ্য পুত্র-শোকে পাগলের ন্যায় ধূলায় পড়িয়া গড়াগড়ি যাইতেছেন। এক একবার উঠিয়া সম্মুখে যাহা পাইতেছেন তাহাই লইয়া নিজের মাথা ফাটাইবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু বাধা পাইয়া আবার ধূলায় পড়িয়া গড়াগড়ি দিতেছেন। সকলে তাঁহাকে ধরিয়া সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু বৃথা চেষ্টা ; তাহাতে তাঁহার

পুত্র-শোকাগ্নি যেন আরও জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। এইভাবে বহুক্ষণ ধরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া সকলের চেষ্টায় অবশেষে রায় মহাশয় কতকটা সান্ত্বনা লাভ করিলেন, প্রতিবেশিগণ তখন, একে একে নিজ নিজ গৃহে চলিয়া গেল।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রায় মহাশয়ের সংসারে এক্ষণে তিনি নিজে, কনিষ্ঠ পুত্র বিমলেন্দু এবং বিধবা পুত্রবধূ সুভাসিনী। প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার গৃহিণীর কাল হইয়াছিল। সেই সময় তাঁহার বন্ধু-বান্ধবগণের অনেকেই পুনরায় তাঁহাকে বিবাহ করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। রায় মহাশয়ের নিজেরও যে এ বিষয়ে কতকটা আন্তরিক ইচ্ছা না ছিল, এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু একে তাঁহার বৃদ্ধ বয়স, তাহাতে আবার সংসারে উপযুক্ত পুত্র ও পুত্র-বধূ বর্ত্তমান, সুতরাং এমন অবস্থায় বিবাহ করিলে লোক-নিন্দার ভাগী হইতে হইবে মনে করিয়া সে-সময়ে তিনি বিবাহ করা সঙ্গত বোধ করেন নাই। এক্ষণে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের অকাল-মৃত্যুতে সংসার চালাইবার লোকের অভাব হইয়াছে বলিয়া

তাঁহার পূর্ব্বকথিত বন্ধুবান্ধবগণ সেই পুরাতন কথা তুলিয়া আবার তাঁহাকে বিবাহ করিবার পরামর্শ দিতে লাগিলেন। অবশ্য এই সময়ে তাঁহার সংসারে লোকাভাব কতকটা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি যদি অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে এতটা যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত না; কিন্তু তাহা তিনি পারিলেন না। তাঁহার পুত্রবধূ সুভাষিণীকে এক্ষণে বিধবার আচারে থাকিতে হয়; সুতরাং মাছ রাঁধিয়া দিবার লোকের অভাব হইয়াছে বলিয়া রায় মহাশয় দুই দিনেই পাগল হইয়া উঠিলেন। তিনি যদি তাঁহার বালিকা বিধবা পুত্রবধূর সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও নিরামিষ ভোজনে অভ্যস্ত করিতেন, তাহা হইলে আর তাঁহাকে এই বৃদ্ধ বয়সে আর একটি বালিকার বৈধব্যের পথ প্রশস্ত করিতে হইত না। কিন্তু তিনি এতদিন কেবল লোকনিন্দার ভয়ে যে-কার্য্য করিতে পারেন নাই, তাহাই করিবার এমন সুবর্ণ সুযোগ পাইয়া কোন মতেই উহা পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। এই সময়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠাকন্যা তরঙ্গিণী ও তাহার স্বামী তারকনাথ তাঁহাকে অনেক করিয়া বুঝাইতে লাগিল যে, এমন অবস্থায় বিবাহ করিলে সংসারে একটা নূতন অশান্তির সৃষ্টি হওয়া অনিবার্য্য; অতএব তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র—বিমলেন্দুর বিবাহ দিলেই সকল দিক রক্ষা হইতে পারে। কিন্তু

রায় মহাশয় তাহাদের পরামর্শ গ্রাহ্য না করিয়া কৃষ্ণপুরের বরদা ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী শ্যামপ্রভার সহিত তাঁহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিলেন।

বরদা ভট্টাচার্য্য মহাশয় অত্যন্ত দরিদ্র; তাহা না হইলে এমন করিয়া তাঁহার কন্যাটি জবাই করিতেন কি না সন্দেহ। যাহা হউক তিনি মাধবপুরে কন্যা তুলিয়া আনিয়া বিবাহ দিলেন। পূর্ব্বোক্ত যজ্ঞেশ্বরবাবুর বাটীতে থাকিয়াই বিবাহ হইল। যথা-সময়ে বিবাহ শেষ হইলে রায় মহাশয় নূতন বধূকে লইয়া বাড়ী আসিলেন। কিন্তু তাঁহাদের পাল্কী যখন বাড়ীর উঠানের উপর আসিয়া নামিল, তখন বরবধূকে বরণ করিয়া তুলিবার জন্য কেহই সেখানে উপস্থিত ছিল না। বলা বাহুল্য এ কার্য্য করিবার জন্য আগ্রহ মোটেই কাহারও ছিল না। বিবাহের পূর্ব্বে রায় মহাশয় তাঁহার জ্যেষ্ঠা দুই কন্যাকে শ্বশুর বাড়ী হইতে আনিবার জন্য তাহাদের নিকট লোক পাঠাইয়াছিলেন: কিন্তু তাহারা এত শীঘ্র মা ও ভাইএর শোক ভুলিয়া পিতার দ্বিতীয় বার বিবাহ দেখিবার জন্য আসিতে রাজী হয় নাই। সংসারে এখন কার্য্যক্ষম স্ত্রীলোক একমাত্র বিধবা পুত্রবধূ সুভাষিণী; সুতরাং নূতন বউকে বরণ করিবার জন্য তাহারই খোঁজ পড়িল। তাহাকে কিন্তু সহজে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। অনেক চেষ্টার পর সকলে দেখিতে

পাইল যে, অভাগিনী গৃহের এক কোণে মাটীর উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া চোখের জলে গৃহতল সিক্ত করিতেছে। সকলেই তাহাকে এমন দিনে কাঁদিয়া কাটিয়া অমঙ্গল ডাকিয়া আনিতে নিষেধ করিল—উঠিয়া বধূকে বরণ করিয়া তুলিবার জন্য টানাটানি করিতে লাগিল। কিন্তু সে দুঃখিনীর হৃদয়ে তখন বিষম স্বামী-শোক বাজিতেছিল; বাহিরের উৎসব ও আনন্দ-কোলাহল তাহার নিকট বৃশ্চিক দংশনের মত বোধ হইতেছিল; পৃথিবী তাহার নিকট অন্ধকারময় দেখাইতেছিল। সে কোন্ প্রাণে যাইয়া নববিবাহিতা শ্বাশুড়ীকে বরণ করিয়া ঘরে তুলিবে? সকলের ডাকাডাকিতে তাহার সেই তীব্র শোকের বন্যা আরও প্রবলবেগে ছুটিতে লাগিল—অভাগিনী আরও লুটাপুটি করিয়া কাঁদিতে লাগিল। অগত্যা রায় মহাশয়ের অষ্টম বর্ষীয়া কনিষ্ঠা কন্যা দক্ষবালা যাইয়া বরবধূকে বরণ করিয়া তুলিল।

তারপর বউ পরিচয়ের সময় তাহার মুখ দেখিবার পালা আসিল। কে প্রথমে মুখ দেখিবে? আবার পুত্রবধূ সুভাষিণীর ডাক পড়িল। যে ডাকিতে গিয়াছিল, সে বিফল হইয়া ফিরিয়া আসিল। সুভাষিণীর দুঃখ দেখিলে হিমালয়ের পাষাণও বুঝি গলিয়া যাইত; মানুষের কথা কোন্ ছার্। সুতরাং রায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র বিমলেন্দু যাইয়া তাহার স্বর্গীয়া মাতার

একখানি বাজু দিয়া প্রথমে তাহার নূতন বিমাতার মুখ দেখিল।

বিবাহের আর আর অঙ্গ যথারীতি নির্ব্বাহিত হইল। তারপর রায় মহাশয় তাঁহার পঞ্চবিংশ বর্ষীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র বিধুভূষণের মৃত্যুর তিন মাস অতীত না হইতেই তাঁহার নব বিবাহিতা পত্নীকে লইয়া বিলাসের স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিলেন।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রায় মহাশয় সুখের আশা করিয়াই এই বৃদ্ধ বয়সে পুনরায় বিবাহ করিয়াছিলেন; কিন্তু অতঃপর তাঁহার অদৃষ্টে এমনই সুখ ভোগ হইতে লাগিল যে সে ভোগ করিবার জন্য তিনি অধিক দিন জীবন ধারণ করিতে পারিলেন না। দুই একটী দৃষ্টান্ত দিলেই বোধ হয় বুদ্ধিমান পাঠক-পাঠিকা সকল কথা বুঝিতেপারিবেন।

দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করিলে সাধারণতঃ যেমন হইয়া থাকে, রায় মহাশয়ের বাড়ীতেও তাহাই হইতে লাগিল। তাঁহার অত্যধিক আদর ও প্রশ্রয় পাইয়া তাঁহার নবপরিণীতা পত্নী শ্যামপ্রভা ক্রমে ক্রমে আপনাকে সংসারের একমাত্র কর্ত্রী বলিয়া মনে করিতে লাগিল; এবং সংসারের যত কিছু কাজকর্ম্ম সমস্তই

বিধবা পুত্রবধূ সুভাষিণীর ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া নিজে দিনরাত কেবল নভেল লইয়া সময় কাটাইত; আর সময়ে অসময়ে অকারণে সুভাষিণীর উপর বিষম বাক্যবাণ নিক্ষেপ করিত। এদিকে সকলের পিছনে শুইয়া আবার সুভাষিণী চারি দণ্ড রাত্রি থাকিতেই বিছানা হইতে উঠিতেন, তারপর সমস্ত দিন গাধার মত কেবল খাটিয়াই যাইতেন; একদিন এক মূহূর্ত্তের তরেও তাঁহার বিশ্রাম লইবার উপায় ছিল না।

দশমীর দিন রাত্রিতে মাছ আসিয়াছে। সুভাষিণী হবিষ্য ঘরে ভাত, ডাল, তরকারী প্রভৃতি রাঁধিয়া শ্যামপ্রভাকে গিয়া বলিলেন,—"ছোট মা! তোমার মাছের ঘরে ব্যঞ্জনটা রাঁধিয়া লও; আজ আমার দশমী, মাছ ছুঁইব না।" শ্যামপ্রভা অমনি মুখখানি ভারি করিয়া বলিলেন,—"আমার আজ মাথা ব্যথা করিতেছে, আমি মাছ রাঁধিতে পারিব না।" সুভাষিণী আবার বলিলেন,—তাহা হইলে মাছগুলা কি নষ্ট হইয়া যাইবে? আমার যে কাল উপবাস, রাত্রে পিপাসা পাইলে একটু জল খাইতে হইবে; কেমন করিয়া মাছ ছুঁইব?" অমনি শ্যামপ্রভা বিষম রাগ করিয়া বলিলেন,—"অমন যদি তোমাকে নবাব পুত্রীর মতন থাকিতে হয়, তাহা হইলে তোমার এ সংসারে স্থান হইবে না। সময়ে অসময়ে যদি শরীরটাকে একটু আরামই দিতে না

পারিলাম, তাহা হইলে আমার অমন লোক থাকায় লাভ কি? সুভাষিণী আর কি করেন? চোখের জল মুছিতে মুছিতে যাইয়া মাছ রাঁধিয়া দিলেন; দশমীর দিন রাত্রেও তাঁহার ভাগ্যে একটু জল খাওয়া ঘটিয়া উঠিল না।

আর এক দিনের কথা। রায় মহাশয় ও বিমলেন্দু মাছের ঘরে খাইতে বসিয়াছেন, তাঁহাদের এক পার্শ্বে বালিকা দক্ষবালাও খাইতে বসিয়াছে। দুপুর বেলা সুভাষিণী মাছের ঘরে আসিতে পারেন না; সুতরাং কে তাহার মাছের কাঁটা বাছিয়া দিবে? খাইতে খাইতে সহসা বালিকার গলায় একটী কাঁটা বাধিয়া গেল; সে কাসিতে কাসিতে পাতের গোড়ায় বমি করিয়া ফেলিল। অমনি শ্যামপ্রভা আসিয়া তাহার পিঠে ধপাধপ লাথি সুরু করিয়া দিল। বালিকার অপরাধ, সে দেখিয়া যায় নাই কেন? বিমলেন্দু তাহার মাতৃহীনা ছোট বোনটির দুর্দ্দশা দেখিয়া খাওয়া ছাড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া গেল। সুভাষিণী হবিষ্যঘর হইতে কান্না শুনিয়া দৌড়িয়া আসিলেন; বালিকাকে কাঁদিতে দেখিয়া শ্যামপ্রভাকে বলিলেন, "আহা, তোমার কি একটু মায়াদয়া থাকিতে নাই? কচি মেয়ে—মা নাই—উহাকে কি এমন করিয়া মারিতে আছে?" আর যায় কোথায়? সঙ্গে সঙ্গে শ্যামপ্রভা সুভাষিণীকে পঞ্চাশগণ্ডা কড়া

কথা শুনাইয়া দিল। বলিল,—“তোমার এত এত কথা শুনিয়া আমি কখনই থাকিতে পারিব না। তুমি এমন করিয়া যদি মুখ করিবে, তাহা হইলে এ বাড়ীতে তোমার স্থান হইবে না।” সুভাষিণীর সে দিন আর খাওয়া হইল না। হবিষ্যঘরে রাঁধা-ভাত ফেলিয়া তিনি তাঁহার শুইবার ঘরে যাইয়া মেজের উপর আঁচল পাতিয়া শুইয়া গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। প্রথমে দক্ষবালা, পরে বিমলেন্দু যাইয়া তাঁহার হাত ধরিয়া অনেক টানাটানি করিল। কিন্তু সুভাষিণী উঠিলেন না; তাঁহার রাঁধাভাত নষ্ট হইল, সমস্ত দিন উপবাসে গেল।

রায় মহাশয়ের বাড়ীতে নিত্য নিত্য এইরূপ ঘটনা ঘটিতে লাগিল। এমন দিন যাইত না, যেদিন বালিকা দক্ষবালা তাহার বিমাতার হাতে দুই চারি ঘা মার না খাইত; এমন সপ্তাহ যাইত না, যাহার মধ্যে সুভাষিণী দুই একদিন উপবাস না করি-তেন। রায় মহাশয় এ সকল দেখিয়া কষ্ট অনুভব না করিতেন তাহা নহে; কিন্তু পত্নীর বিরাগের ভয়ে তিনি মুখ ফুটিয়া কোন কথাই বলিতে পারিতেন না। এমনই ভাবে নিত্য অশান্তির মধ্য দিয়া রায় মহাশয়ের দ্বিতীয় বিবাহের পর তিন মাস অতীত হইয়া গেল। এতদিনে তিনি বিধুভূষণের মৃত্যুশোক সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছিলেন।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আর একদিন রাত্রিতে রায় মহাশয় ও বিমলেন্দুর সঙ্গে দক্ষবালা মাছের ঘরে খাইতে বসিয়াছে। সেদিন রাত্রি কিছু বেশী হইয়াছিল; তাই খাইতে বসিয়া নিদ্রায় বালিকার চোখ দুইটি বুজিয়া আসিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া শ্যামপ্রভা তাহাকে আর খাওয়াইতে চেষ্টা না করিয়া আঁচাইয়া দিবার জন্য ঘরের বাহিরে টানিয়া লইয়া গেল। আঁচাইতে গিয়া বালিকা ঘুমের ঘোরে এক জায়গায় বসিয়া পড়িল। শ্যামপ্রভা হাতে করিয়া জল লইয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিল; কিন্তু নিদ্রায় বালিকার চোখ তখন বুজিয়া আসিয়াছিল; সে অনেক ডাকাডাকিতেও সে-স্থান হইতে উঠিল না। ইহা দেখিয়া শ্যামপ্রভা কিছুতেই তাহার রাগ সামলাইতে পারিল না; নিদারুণ প্রহারে বালিকার সর্ব্বাঙ্গ জর্জ্জরিত করিয়া দিল। এদিকে তাহার কাঁদা শুনিয়া হবিষ্যঘর হইতে সুভাষিণী দৌড়িয়া আসিলেন, দেখিলেন তখনও শ্যামপ্রভার ক্রোধ শান্তি হয় নাই; তখনও শ্যামপ্রভা বালিকার গাল দুইটী চাপিয়া ধরিতেছে। মাতৃহীনা বালিকাকে সুভাষিণী আপনার সন্তান অপেক্ষাও অধিক স্নেহ

করিতেন। বিমাতার হস্তে তাহার এই দুর্দ্দশা দেখিয়া তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না—সবলে শ্যামপ্রভার হাত হইতে তাহাকে মুক্ত করিয়া লইলেন। ক্রোধে ও দুঃখে তখন সুভাষিণীর বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইতেছিল না; তিনি কেবলমাত্র শ্যামপ্রভাকে বলিলেন,—"আহা কচি মেয়ে, এমন করিয়া রোজ রোজ মারিলে এ যে মরিয়া যাইবে। তোমার অন্তঃকরণে কি মায়ামমতা কিছুই নাই?" শ্যামপ্রভা অমনি ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন; এই একটা কথার বদলে সুভাষিণীকে পঞ্চাশটা কথা শুনাইয়া দিলেন, বলিলেন,—"তোমার আস্পর্দ্ধা দেখিতেছি দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে, তুমি আমাকে কোনো দিনই দশটা কথা না বলিয়া জলগ্রহণ কর না। আমি কি তোমার কেনা দাসী যে নিত্য নিত্য এমনি করিয়া তোমার কথা শুনিয়া থাকিব? আমার সঙ্গে তোমার এ বাটীতে স্থান হইবে না তাহা আবার বলিতেছি শুন। হয় তুমি এখনই বাড়ীর বাহির হও, না হয় তুমিই শ্বশুরের সঙ্গে ঘরকন্না কর, আমি আমার বাপের বাড়ী চলিলাম।" সুভাষিণী কাঁদিয়া বলিলেন, "তুমি নিত্য নিত্য আমাকে ওই একই খোঁটা দাও। আমি এখন আর কোন্ অধিকারে এ বাড়ীতে থাকিতে চাহিব? এখন তোমারই অধিকার—তুমিই থাক, আমার দুই চোক যে দিকে যায়, সেই দিকে চলিলাম।"

এই বলিয়া সুভাষিণী দক্ষবালাকে কোলে করিয়া লইয়া গিয়া তাহার বিছানায় শোয়াইয়া আসিলেন। তারপর একবস্ত্রে গৃহের প্রাঙ্গণে আসিয়া মনে মনে তাঁহার মৃত স্বামীর উদ্দেশে অসংখ্য প্রণাম করিয়া বলিলেন,—"ইষ্টদেব! তুমি যখন নাই, তখন আর দাসীর এ বাড়ীতে স্থান নাই। আজ তুমিও যেখানে দাসীও সেইখানে চলিল।" এই বলিয়া সুভাষিণী কাহাকেও কিছু না বলিয়া সেই অন্ধকার নিশীথে গৃহের বাহির হইয়া কোথায় অন্তর্হিত হইয়া পড়িলেন।

রায় মহাশয় আহার শেষ করিয়া এতক্ষণে সেখানে উঠিয়া আসিলেন; দেখিলেন শ্যামপ্রভা একাকিনী প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আছে। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি হইয়াছে? বউমা কোথায় গেল?" শ্যামপ্রভা গম্ভীরমুখে উত্তর করিল,—"বউমা কোথায় গেল তাহা আমি জানি না। তাঁহার গুণের কথা কত বলিব? তিনি এ বাড়ীতে আমার সঙ্গে একত্রে থাকিবেন না।" এমন সময়ে বিমলেন্দুও সেখানে আসিল এবং আসিয়াই বলিল—"বাবা! আমি বৌদিদিকে চোক মুছিতে মুছিতে চলিয়া যাইতে দেখিয়াছি; নিশ্চয়ই তিনি রাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। শ্যামপ্রভা ক্রোধভরে বলিলেন,—"যমের বাড়ী ভিন্ন আর তাহার যাইবার স্থান কোথায় আছে?

তোমরা অত বাড়াবাড়ি করিও না ; সে আপনা হইতেই সুরসুর করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইবে।" রায় মহাশয় অনেক সহ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু আজ আর পারিলেন না ; ক্রোধভরে শ্যামপ্রভাকে বলিলেন,—"আমি বহুদিন হইতে তোমার অত্যাচার সহিয়া আসিতেছি, কিন্তু আর না। যেদিন হইতে তুমি এখানে আসিয়াছ, সেইদিন হইতে আমার শান্তির সংসারে অশান্তি ডাকিয়া আনিয়াছ। তোমার অত্যাচারে আজ আমার কুললক্ষ্মী গৃহত্যাগিনী হইল। আমি পুত্রশোক ভুলিয়া গিয়াছিলাম; কিন্তু তোমার অত্যাচারে আমার সেই পুত্রশোকাগ্নি আবার প্রবলবেগে জ্বলিয়া উঠিল। এবার তুমিও তোমার কৃতকর্ম্মের ফল ভোগ কর ; আজ হতে তুমি আমার পরিত্যজ্যা।" অন্য কোন স্ত্রীলোক যদি স্বামীর মুখে এমন কথা শুনিত, তবে সেই মুহূর্ত্তে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িত ; কিন্তু শ্যামপ্রভা তাহা করিল না ; উত্তেজিতকণ্ঠে সে বলিল,—"বেশ, তাহাই হউক, আমাকে এখনই আমার বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দাও। তুমি তোমার ব্যাটার বউকে লইয়া সংসার কর, আমার তাহাতে কিছুমাত্র আপত্য নাই।" রায় মহাশয়ও তেমনি উত্তেজিত কণ্ঠে কহিলেন,—"বেশ—তাহাই হউক, কাল সকালেই তুমি তোমার পিত্রালয়ে চলিয়া যাও, আমি সকল জ্বালার হাত হইতে অব্যাহতি

পাই।” এই বলিয়া তিনি তাঁহার বাহির বাড়ীতে চলিয়া আসিলেন ; এবং তখনই চারিদিকে লোকজন পাঠাইয়া সুভাষিণীর অনেক খোঁজ করাইলেন ; কিন্তু সকলই বৃথা হইল ; অনেক, খুঁজিয়াও কেহ সুভাষিণীর কোন সন্ধান করিতে পারিল না। অনেক রাত্রিতে রায় মহাশয় ক্লান্ত হইয়া বাহির বাটীর ফরাসের উপর একটা বালিশ মাথায় দিয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিলেন. কিন্তু কিছুতেই তাঁহার চোখে নিদ্রা আসিল না। নিষ্ফল ক্রোধ ও দুশ্চিন্তায় দগ্ধ হইয়া অবশিষ্ট রাত্রিটুকু তিনি কোন রকমে কাটাইয়া অতি প্রত্যূষেই গাত্রোত্থান করিলেন, এবং তখনই শ্যামপ্রভার জন্য পাল্‌কী-বেহারা ডাকাইয়া আনিলেন। শ্যাম-প্রভাও কাহাকেও কিছু না বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে পিত্রালয়ে চলিয়া গেল।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এদিকে সুভাষিণী গৃহের বাহির হইয়াই সোজা রাস্তা ধরিয়া দ্রুত পদে দক্ষিণ দিকে চলিতে লাগিলেন। তাঁহাদের বাড়ীখানি গ্রামের শেষ সীমায় অবস্থিত ; সুতরাং বাড়ী ছাড়িতেই তিনি একেবারে মাঠে আসিয়া পড়িলেন। এই পথ ধরিয়া সোজা দক্ষিণ মুখে কিছু দূর অগ্রসর হইতেই তিনি একটী ক্ষুদ্র নদীর ধারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে আসিয়া তিনি মুহূর্ত্তের জন্য দাঁড়াইলেন। রজনী ঘোরান্ধকারময়ী। মাথার উপরে অন্ধকার আকাশে নক্ষত্র জ্বলিতেছিল ; পদনিম্নে বীচিমালিনী ক্ষুদ্র পাঙ্গাল নদী কুলু কুলু রবে প্রবাহিত হইতেছিল; নিশীথ অসংযত বায়ু পাঙ্গালের ক্ষুদ্র বক্ষের উপর দিয়া হু হু শব্দে বহিয়া যাইতেছিল ; এবং অদূরে শ্মশান-ক্ষেত্রে দুই একটা শৃগাল মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিয়া উঠিতেছিল। কিন্তু এ সকলের প্রতি তাঁহার কিছু মাত্র লক্ষ্য ছিল না। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, যখন শ্বশুরগৃহে তাঁহার আর স্থান নাই, তখন তাঁহার প্রাণ ধারণ করিয়া লাভ কি ? এই মনে করিয়া তিনি নদীতে ডুবিয়া মরিবার জন্য দৃঢ়সংকল্প হইলেন। সেই

অন্ধকার নিশীথে সুভাষিণী ডুবিয়া মরিবার জন্য নিঃশব্দে নদীর জলে নামিতে লাগিলেন। তিনি সাহসে বুক বাঁধিয়া এক গলা জল পর্য্যন্ত নামিলেন; কিন্তু এই সময় হঠাৎ তাঁহার মনে হইল যে এ ভাবে আত্মহত্যা করিলে তিনি ইহকাল ও পরকাল দুইই নষ্ট করিবেন। এখনও যে সংসারে তাঁহার যথেষ্ট কাজ রহিয়াছে। যদি তিনি এখন প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তবে কে মাতৃহীনা বালিকা দক্ষ বালাকে লালন-পালন করিবে? এই সকল কথা মনে করিয়া তাঁহার আর মরা হইল না। তিনি চিন্তাকুল মনে ধীরে ধীরে তীরে উঠিলেন এবং আর্দ্র বসনেই নিকটস্থ কালীবাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপে যাইয়া ক্লান্তিবশতঃ ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

প্রভাতে বিমলেন্দু শৌচকার্য্য সমাপন করিয়া মাঠ হইতে বাড়ী ফিরিতেছিল, এমন সময়ে সে পার্শ্ববর্ত্তী মণ্ডপঘরের বারান্দায় তাহার স্নেহময়ী বউদিদিকে নিদ্রিতা অবস্থায় দেখিতে পাইল। দেখিয়াই তাহার হৃদয়ে আনন্দের তরঙ্গ বহিতে লাগিল; সে তৎক্ষণাৎ যাইয়া সুভাষিণীকে নিদ্রা হইতে জাগরিতা করিল; এবং তাঁহাকে বাড়ী লইয়া যাইবার জন্য টানাটানি করিতে লাগিল। সুভাষিণীও সকল দিক ভাবিয়া চিন্তিয়া ইহাতে

বেশী আপত্তি করিলেন না;—নিঃশব্দে বিমলেন্দুর সহিত গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

ইহার কয়েকদিন পরেই রায়-মহাশয় হঠাৎ কঠিন রোগে আক্রান্ত হইলেন। সুভাষিণী ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলিয়া গিয়া দিন রাত্রি অক্লান্তভাবে শ্বশুরের সেবা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি একাকিনী কয়দিক বজায় রাখিতে পারেন? তাঁহার অনবরত শ্বশুরের নিকট থাকার দরুণ সংসারের অন্যান্য কাজ-কর্ম্ম সম্পন্ন হওয়া অতিশয় কঠিন হইয়া উঠিল। আর যাহাই হউক, বিমলেন্দু ও দক্ষবালা সময়মত এক মুঠা ভাত পাইলেই যথেষ্ট হইত; কিন্তু সুভাষিণী তাহাও পারিয়া উঠিতেন না। সুতরাং উপায়ান্তর না দেখিয়া রায়-মহাশয় তাঁহার পত্নীকে আনিবার জন্য পাল্কী সহ শ্বশুরবাড়ীতে লোক পাঠাইলেন। কিন্তু লোকে শুনিলে বিস্মিত হইবে যে, স্বামীর এমন দুঃসময়েও শ্যামপ্রভা তাঁহার নিকট আসিল না। সে তথা হইতেই তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইল;—"সুসময়ে তোমার ব্যাটার বউকে মিষ্ট লাগিয়াছিল; এখন অসময়ে বিষ্ঠা-মূত্র পরিষ্কার করিবার বেলায় আমাকে মনে পড়িয়াছে কেন? সে সময় যিনি মিষ্ট লাগিয়াছিলেন, এখন তিনি তিক্ত হইলেন কেন? যাহা হউক, আমাকে যখন তোমার বাড়ী হইতে বিদায় করিয়াই



৬

দিয়াছ, তখন বৃথা আমাকে ডাকাডাকি কেন? আমি আর তোমার গৃহে যাইতে ইচ্ছুক নহি।" শ্বশুরবাড়ী হইতে লোক ফিরিয়া আসিয়া যখন রায়-মহাশয়কে এই কথা শুনাইল, তখন তিনি তাঁহার দুর্ব্বল হৃদয়ে যে বিষম বেদনা অনুভব করিলেন, ভুক্ত ভোগী ভিন্ন অন্যের পক্ষে তাহা যথাযথ বুঝিতে পারা কিছুতেই সম্ভবপর নহে। ভগ্ন হৃদয়ে তিনি পার্শ্ববর্ত্তী সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "অভাগিনী নিজ কর্ম্ম দোষে সকলই মজাইল। বিধাতার হাত, আমি কি করিব?" ইহার পর তিনি নিজের অবস্থা আশঙ্কাজনক বিবেচনা করিয়া তাঁহার সম্পত্তির উইল করিবার জন্য প্রতিবাসীদিগকে ডাকাইয়া আনিলেন। সকলে আসিয়া একত্র হইলে তিনি মুহুরীকে লিখিতে বলিলেন—"আমি আমার পঞ্চাশ হাজার টাকার সম্পত্তির এইরূপ উইল করিয়া যাইতেছি যে, কনিষ্ঠ পুত্র বিমলেন্দু আট আনা, পুত্রবধূ সুভাষিণী পাঁচ আনা, এবং কনিষ্ঠা কন্যা দক্ষবালা তিন আনা অংশ পাইবে। পত্নী শ্যামপ্রভা অসৎ ব্যবহারের জন্য তাহার অংশ হইতে বঞ্চিতা হইল। কেবল মাত্র বিমলেন্দুর নিকট হইতে তাহার ভরণপোষণের জন্য মাসে দশ টাকা করিয়া সাহায্য পাইবে।" উইলের এই মর্ম্ম শুনিয়া—শ্যামপ্রভার অংশে শূন্য দেখিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইল;

তাহাকে 'কিছু লিখিয়া দিবার জন্য সকলেই রায়-মহাশয়কে বিশেষভাবে অনুরোধ করিল; কিন্তু তিনি কাহারও কথাই কানে তুলিলেন না। মুহুরী লিখিতে সঙ্কুচিত হইতেছে দেখিয়া তিনি পুনরায় তাহাকে বলিলেন;—"লেখ, এইরূপই হইবে।" অতঃপর উইল লিখিত এবং সাক্ষী প্রভৃতি সমেত স্বাক্ষরাদি হইয়া গেল।

সেইদিনই শেষ রাত্রে রায়-মহাশয় তাঁহার পরিবারবর্গকে অপার শোকসাগরে ভাসাইয়া ইহলোক ত্যাগ করিলেন। বিষাদপ্রতিমা সুভাষিণী আবার নূতন বিষাদ-সাগরে নিমজ্জিতা হইলেন; কিন্তু ভগবান তাঁহার জন্য কঠোর পরীক্ষার বিধান করিয়াছিলেন। বিমলেন্দু ও দক্ষবালাকে এ বিপদে সান্ত্বনা দিবার দায়িত্ব তাঁহার; সুতরাং এই পর্ব্বতপ্রমাণ বিপদরাশি মাথায় লইয়াও তিনি পথহারা হইলেন না; মাতৃপিতৃহারা বালকবালিকা দুইটিকে বুকে করিয়া তিনি সংসারের দুর্গম পথে দৃঢ় পদে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রায়-মহাশয়ের মৃত্যুর পর মাধবপুরের প্রতি গৃহস্থের বাড়ীতে সকাল সন্ধ্যা কেবল একই কথার আলোচনা হইতে লাগিল। তিনি জরাগ্রস্ত হইয়াও যে বুদ্ধির দোষে অযথা একটী বালিকার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া গিয়াছেন, ইহাই এই সকল আলোচনার স্থূলমর্ম্ম। মৃতের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন সর্ব্বত্র নিষিদ্ধ; কিন্তু মাধবপুরের অধিবাসিগণ একথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল। সত্য বটে রায়-মহাশয় বহু সদগুণে অলঙ্কৃত ছিলেন; কিন্তু তিনি বৃদ্ধবয়সে—জ্যেষ্ঠ পুত্রের অকালমৃত্যুর তিন মাস অতীত না হইতেই পুনরায় বিবাহ করিয়া সমাজের উপর যে বিষম অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাঁহাতে তাঁহার নিষ্কৃতি পাইবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। সুতরাং লোকে যে তাঁহাকে একটী বালিকার সর্ব্বনাশ করিবার অপরাধে অপরাধী করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

এদিকে পিতার শ্রাদ্ধাদি শেষ হইবার পর সুভাষিণীর পরামর্শে বিমলেন্দু একদিন কৃষ্ণপুরে তাহার বিমাতার নিকট

যাইয়া অশেষ-অনুনয়-বিনয় করিয়া তাঁহাকে বলিল,—"বাবা স্বর্গে গিয়াছেন ; তাঁর অবর্ত্তমানে সংসার চালাইবার লোকের একান্ত অভাব হইয়াছে। আপনারও নিজের বাড়ীঘর ছাড়িয়া চিরদিন বাপের বাড়ী থাকা সঙ্গত নয়। সুতরাং আমার বিনীত নিবেদন এই যে, আপনি সংসারে যাইয়া আপনার ন্যায্য গৃহিণীর পদ গ্রহণ করিয়া আমাদের লালন-পালন করুন।" কিন্তু অভাগিনী শ্যামপ্রভা কিছুতেই ইহাতে রাজী হইল না, বরং বিমলেন্দুকে সে অত্যন্ত কঠোরভাবে বলিল,—"তোমাদের সংসারে যাইয়া আমি কখনই দাসীবৃত্তি করিতে পারিবনা। তুমি পণ্ডশ্রম করিও না—চুপচাপ বাড়ী ফিরিয়া যাও।" অগত্যা বিমলেন্দু গৃহে প্রত্যাগমন করিল, এবং সকল কথা তাহার বউদিদির কাছে নিবেদন করিল। শুনিয়া সুভাষিণী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিলেন,—"ভগবান এখনও একে সুমতি দিলেন না। যাহা হউক আমি আমার কর্ত্তব্য করিয়া রাখিলাম। এর বেশী আর আমি কি করিতে পারি?"

কিছুদিন পরে শ্যামপ্রভার পিতা বরদা ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্বর্গারোহণ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার একমাত্র পুত্র গোপীমোহন সংসারের কর্ত্তা হইল। গোপীমোহন অতিরিক্ত পরিমাণে স্ত্রৈণ ছিল ; সকল বিষয়েই সে নিজে কোন বুদ্ধি খরচ

না করিয়া তাহার স্ত্রীর পরামর্শমত চলিত। গোপীমোহনের স্ত্রী চারুশীলা তাহার ননদিনীকে দুই চক্ষে দেখিতে পারিত না। এখন সংসারে তাহার আধিপত্য অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাওয়ায় শ্যামপ্রভাকে সে নানা রকমে ক্লেশ দিতে লাগিল। শ্যামপ্রভা প্রথম প্রথম কিছুদিন সবই সহ্য করিয়া রহিল; কিন্তু অবশেষে উহা তাহার ঘোর অশান্তির কারণ হইয়া উঠিল। ক্রমে শ্যামপ্রভা দুশ্চিন্তায় অস্থির হইয়া উঠিল। একবার ভাবিল যে, ভ্রাতৃবধূর হাতে এ নরকযন্ত্রণা সহ্য করা অপেক্ষা বিমলেন্দুর সংসারে যাইয়া, সেখানে গৃহিণীর পদ গ্রহণ করিয়া চিরশান্তিতে বাস করিবে; কিন্তু কুবুদ্ধি আসিয়া তাহার কাণে কাণে বলিয়া দিল,—'বিমলেন্দুর সংসারে কি সুভাষিণীর হাতে যন্ত্রণা ভোগ করিতে যাইবে? সে এখন সময় পাইয়া তোমার পূর্ব্ব ব্যবহারের প্রতিশোধ দিবে তাহা কি ভুলিয়া গিয়াছ?' সুতরাং সেখানেও শ্যামপ্রভার যাওয়া হইল না! নিদারুণ মানসিক কষ্টে সে পাগলিনীর মত হইল। অবশেষে কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া সে আত্মহত্যা দ্বারা এ দুঃখের অবসান করিবে স্থির সংকল্প করিল।

একদিন প্রাতঃকালে অনেক বেলা হইয়া গেল, তথাপি শ্যামপ্রভা তাহার শয়ন গৃহের দরজা খুলিল না। বাড়ীর সকলে

বাহির হইতে অনেক ডাকাডাকি করিল; কিন্তু তাহাতে কোন ফল না হওয়ায় অবশেষে তাহারা দরজা ভাঙ্গিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। সেখানে তাহারা দেখিতে পাইল যে, শ্যামপ্রভা চিরনিদ্রায় নিদ্রিতা হইয়াছে, আর তাহার পার্শ্বে একটি আফিং গুলিবার পাত্র পড়িয়া আছে। অভাগিনী বিষপানে আত্মহত্যা করিয়াছে। সকলেই তখন তাহার পিতা বরদা ভট্টাচার্য্যকে এজন্য দোষী করিতে লাগিল। স্পষ্টই সকলে বলিল—"মড়ার সঙ্গে বিয়ে দিলে যে এমন হয়, সে কথা কার না জানা আছে? দুইটী বৃদ্ধ মিলিয়া এই বালিকার এমন করিয়া সর্ব্বনাশ করিয়াছে! যে-বাপ গঙ্গাযাত্রী বুড়ার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেয়, সে সত্য সত্য বাপ, না চাঁড়াল?" ভীড়ের মধ্য হইতে একটী বালক বলিয়া উঠিল,—"যখন এর বিয়ে হয়, তখন আপনারা কোথায় ছিলেন? তখন এর বাবাকে মানা করেন নি কেন? নিশ্চয়ই ফলারের লোভে। আপনাদের দুঃখ কিসের? আর একটা ফলারের যোগাড় হইয়াছে বই ত নয়!"

# পূজার অর্ঘ্য

## অপরাজিতা

### প্রথম পরিচ্ছেদ

শৈশবাবধিই হরিদাস আমার প্রতি একান্ত অনুরক্ত। তাহার সুকুমার আননে সর্ব্বদাই একটা স্নিগ্ধ জ্যোতির বিকাশ দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইতাম। সুখে দুঃখে সে আমাকে কখনও পরিত্যাগ করিত না; একান্ত দুঃখের সময়েও আমি তাহার আশ্বাস ও মধুর বাণী শুনিয়া দুঃখের জ্বালা ভুলিয়া যাইতাম।

প্রতিদিন বৈকালে সে আমাদের বাড়ী বেড়াইতে আসিত। তাহার সৌজন্য, বিনয় ও সচ্চরিত্রতায় বাড়ীর সকলেই তাহাকে স্নেহ করিত—আমার ত কথাই নাই। যেদিন তাহার আসিতে একটু বিলম্ব হইত, সেইদিনই আমি ব্যাকুল হইয়া তাহার বাসায় ছুটিয়া যাইতাম। আমাদের অন্তঃপুরেও তাহার অবারিত দ্বার ছিল—বাটীর শিশুরা পর্য্যন্ত তাহার অনুরাগী হইয়া পড়িয়াছিল। সর্ব্বাপেক্ষা তাহার অনুরক্ত হইয়াছিল, দাদার

একমাত্র কন্যা,—আমার পরম স্নেহের পাত্রী অপরাজিতা। যেদিন হরিদাসের আসিতে একটু বিলম্ব হইত, সেইদিনই অপরাজিতা দৌড়িয়া আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিত,—"কই কাকা বাবু! আজত রাঙাদা এলেন না?" অপরাজিতা হরিদাসকে রাঙাদা বলিয়া ডাকিত।

হরিদাস না পড়াইলে অপরাজিতার পড়াই হইত না। আমি যদি কখন তাহাকে লইয়া পড়াইতে বসিতাম, অপরাজিতা কেমন যেন অন্যমনস্ক ভাবে বসিয়া থাকিত; কিছুই মনে রাখিতে বা শিখিতে পারিত না; আমি বিরক্ত হইয়া উঠিয়া যাইতাম। আবার হরিদাস যখন পড়াইতে বসিত, অপরাজিতা বিশেষ মনোযোগ দিয়া তাহার সমস্ত কথা শুনিত, এবং আশ্চর্য্যরূপে সকল কথা মনে রাখিত। দেখিয়া আমি বিস্মিত হইতাম।

হরিদাস সাহিত্যচর্চ্চারও বিলক্ষণ অনুরাগী ছিল। যতক্ষণ সে আমাদের বাসায় বসিয়া অপরাজিতাকে পড়াইত, সেই সময়ের মধ্যে সে যাহা কিছু রচনা করিত তাহাই উৎকৃষ্ট হইত; পক্ষান্তরে অন্য সময়ে তাহার রচনা কিছুমাত্র অগ্রসর হইত না; এবং যদিও বা সে সেই সময়ের মধ্যে দুই এক ছত্র লিখিত, তবে তাহা আদৌ ভাল হইত না। আমি তাহার এই অপূর্ব্ব বিশেষত্ব দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইতাম।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হরিদাসের শিক্ষকতায় অপরাজিতার পাঠের আগ্রহ দিন দিন আশ্চর্য্যরূপে বাড়িয়া যাইতে লাগিল। অতি অল্পকালের মধ্যে সে মাইনর পরীক্ষার পাঠ্যসকল আয়ত্ত করিয়া সংস্কৃত পড়িবার জন্য জেদ করিতে লাগিল। দাদাও তাহার এই ইচ্ছা অপূর্ণ রাখিলেন না। হরিদাসেরই কাছে অপরাজিতা সংস্কৃত পড়া আরম্ভ করিল। উপক্রমণিকা হইতে আরম্ভ করিয়া সুনীতি-বোধকম, হিতোপদেশ, ভট্টি, রঘুবংশ ইত্যাদি সে জলের মত শেষ করিয়া যাইতে লাগিল। তাহার এই অনন্যসাধারণ প্রতিভা দেখিয়া সকলেই যার পর নাই বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিল। সকলের অপেক্ষা বেশী বিস্মিত হইয়াছিল হরিদাস নিজে; কেন না, অপরাজিতার প্রতিভা বুঝিতে পারা তাহার পক্ষে যতটা সম্ভব ছিল, অন্যের পক্ষে তাহা ছিল না। একদিন হরিদাস গল্প করিতে করিতে আমায় বলিল,—"দেখ বিজয়! এ যুগে যে অপরাজিতার মত আশ্চর্য্য প্রতিভা অন্য কোন স্ত্রীলোকের আছে, এমন আমার জানা নাই। এ যেন সেই মণ্ডন মিশ্রের স্ত্রী উভয়

ভারতী। এই সাক্ষাৎ সরস্বতীরূপা দেবী যাহার গৃহ আলো করিবে তাহার মত ভাগ্যবান বুঝি এ দুনিয়াতে আর দ্বিতীয় নাই।" আমিও হাসিয়া বলিলাম, "হাঁ ; কিন্তু এই দেবীকে পাইবার মত যোগ্যতা যাহার আছে, দুনিয়াতে তাহারও যে জোড়া নাই, তাহাও নিঃসন্দেহ।"

ইহার পর হরিদাসের জ্বর হইয়া দিন পনর সে শয্যাগত হইয়া রহিল। অপরাজিতাকে এ কয় দিন পড়াইবার জন্য বাবা একজন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতকে নিযুক্ত করিলেন। পক্ষকাল পরে পণ্ডিত বিদায় লইবার কালে এক আশ্চর্য্য গল্প বলিয়া গেল। অপরাজিতা এই কয়দিন প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও কিছুমাত্র অগ্রসর হইতে পারে নাই। কথাটা আমি বউদিদির কাছে না পাড়িয়া থাকিতে পারিলাম না। তিনি শুনিয়া বলিলেন,—"এমন হওয়া অসম্ভব নয়। হরিদাসের পড়ানোর মধ্যে কি যেন এক অদ্ভুত শক্তি আছে। অপরি তার কাছে একবার শুনিয়াই সমস্ত শিখিয়া ফেলে—নিজে হ'তে আর এর জন্য বিন্দুমাত্র খাটিতে হয় না। এ একটা খুব আশ্চর্য্য ব্যাপার সন্দেহ নাই। আমার মনে হয়—হরিদাসের এই অদ্ভুত শক্তির কাছে অপরি দিন দিন ক্রমেই আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছে।" আমি বলিলাম, "তাহা হইলে কিন্তু উহার বিবাহের বেলায় খুবই সাবধান হইতে হইবে। যদি

ভুলক্রমে যে সে একটা গোঁয়ারের হাতে উহাকে সঁপিয়ে দেওয়া হয়, তবে এই স্বর্গীয় কুসুমটি যে অকালে ঝরিয়া পড়িবে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।" বউদিদি বলিলেন, "হাঁ ঠাকুর-পো, তুমি খুবই দরকারী কথা বলিয়াছ। আমি একদিন শুইয়া শুইয়া আদর করিতে করিতে তাহাকে বলিয়াছিলাম—'অপরি! বিয়ে হ'লে আমাদের ছেড়ে যেতে তোর কষ্ট হবে না?' অপরাজিতা তাহাতে বলিয়াছিল, 'সে কি মা! আমাকে কি তোমরা বিয়ে দিয়ে তাড়িয়ে দেবে নাকি?' আমি যখন বলিলাম,—'সংসারের নিয়মই যে এই মা; যখন মেয়ে হ'য়ে জন্মেছিস্, তখন আর উপায় কি বল?' তখন সে বলিল,—'বিয়ে কি না দিলেই নয়? আমি তো বেশ আছি মা—আমাকে এম্নি থাক্‌তে দাও না।' আমি আবার বলিলাম,'সমাজ যে তা মানে না মা; ডাগর মেয়েকে বিয়ে না দিয়ে ঘরে পূরে রাখ্‌লে সমাজ কখনই তা নীরবে সহ্য কর্‌বে না।' এবার অপরাজিতা একটু উত্তেজিত ভাবে বলিল,—'টোপর মাথায় দিয়ে সাত পাক না ঘুরলেই যদি জা'ত না থাকে, তবে আমাকে বাড়ীর ঠাকুরের সঙ্গেই সাত পাক ঘুরিয়ে দাও না কেন? তা হ'লেত আর কোন ল্যাঠাই থাকে না।' এর মানে কি বল্‌তে পার ঠাকুর পো? আমি বলিলাম,—"মানে আমি খুব বুঝি বউদি। মেয়েটাকে যদি মেরে ফেল্‌তে না চাও, তবে

হরিদাসের সঙ্গেই এর বিবাহের আয়োজন কর।” বউদিদি বলিলেন,—“তা কি আর ঠাকুর হ’তে দেবেন?” আমি বলিলাম, “বাবাকে যদি না বুঝাইতে পার, তা হ’লে বরং বিয়ে না দিয়ে এম্নিভাবে রাখাও ভাল। হত্যা করবার চাইতে সমাজের একটু নিন্দা মাথা পাতিয়া লওয়া খুব কঠিন নয় বউদি।” বউদিদি ম্লানমুখে বলিলেন,—“তা কি আর আমি বুঝি না ঠাকুরপো? কিন্তু সমস্যা যে বড়ই কঠিন, কি হইবে ভগবানই জানেন।” এই সময় দাদা কি একটা কাজের জন্য বউদিদিকে ডাকিলেন, আমিও বিষণ্ণমনে কার্য্যান্তরে উঠিয়া গেলাম।

ইহার অল্প কিছুদিন পরেই আমি অজীর্ণ রোগে আক্রান্ত হইলাম। চিকিৎসকেরা আমাকে বায়ু পরিবর্ত্তনের উপদেশ দিলেন; আমি প্রথমে কিছুদিন বৈদ্যনাথে আসিয়া অবস্থান করিলাম; কিন্তু সেস্থানে আশানুরূপ ফললাভ করিতে না পারায় নেপালের সীমান্ত প্রদেশে অবস্থিত উত্তর পশ্চিমের নেপালগঞ্জে আমার জনৈক আত্মীয়ের বাসায় গমন করিলাম; নেপালগঞ্জের স্বাস্থ্য ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বড় উৎকৃষ্ট। আমি সারাদিন অদূরবর্ত্তী হিমালয়ের সেই অতুলনীয় সৌন্দর্য্য প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিতাম, আর মনে মনে ভাবিতাম, যদি হরিদাস সঙ্গে থাকিত, তবে এখানকার এই দিনগুলি কীসুখেরই না হইত!

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রায় ছয় মাস নেপালগঞ্জে কাটিবার পর একদিন দাদার নিকট হইতে আমি নিম্নলিখিতরূপ একখানি পত্র পাইলাম।

"স্নেহের বিজয়!

কয়দিন তোমার পত্র না পাইয়া চিন্তিত হইয়াছি, ফেরৎ ডাকে তোমার ও সেথাকার আর আর সকলের মঙ্গল-সংবাদ লিখিয়া সুখী করিবে।

পরন্তু অপরাজিতা এক্ষণে দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ করিল। আর তাহার বিবাহ দিতে দেরী ক'রলে চলিবে না। পিতৃদেব সোদপুর রেলওয়ে আফিসের শ্রীমান্ বিমলকুমার চট্টোপাধ্যায়কে অপরাজিতার পাত্র মনোনীত করিয়াছেন। পাত্রটী দেখিতে সুশ্রী ও কুলে মানে অতি উচ্চ। তোমার ইহাতে মত কি, ফেরৎ ডাকে লিখিবে। আমরা এখানে সকলেই ভাল আছি। আশীর্ব্বাদ জানিবে।" ইতি

আঃ—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পত্র পড়িয়া আমি বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলাম। আমাদের

বংশের দুলালী, আমার বড় আদরের অপরাজিতা যে সোদপুরের রেলওয়ে আপিসের সামান্য একটী কেরাণীর হাতে পড়িবে, এ স্মৃতিও আমার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। আমি একান্ত অধীর হইয়া তৎক্ষণাৎ দাদার নিকট নিম্নলিখিত মর্ম্মে একটী টেলিগ্রাম করিয়া দিলাম।

"পত্র পাইলাম। বিমলকুমারের সহিত অপরাজিতার বিবাহ হওয়া অসম্ভব। আমার বক্তব্য না শুনিয়া এ সম্বন্ধে অন্য কিছু করিবেন না। সবিশেষ পত্রে লিখিতেছি।" তারপর বাসায় গিয়া সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকে এই পত্রখানি লিখিলাম।

শ্রীশ্রীচরণ কমলেষু—

শ্রীচরণের আশীর্ব্বাদী পত্র পাইয়া সুখী হইলাম এবং বাটীর সকলে ভাল আছেন সংবাদে নিশ্চিন্ত হইলাম। পরন্তু সোদপুর রেল আপিসের শ্রীবিমলকুমারের সহিত অপরাজিতার বিবাহের প্রস্তাব হইতেছে শুনিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলাম। আমাদের পরম স্নেহের অপরাজিতা যে বিমলকুমারের মত একটা বানরের হাতে পড়িবে এ কথা মনে করিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে।

বিমলকুমারের গুণের কথা কি আপনি কিছুই অবগত নহেন? এই যুবক মাত্র "কুড়িটী টাকা মাহিনা পায়, কিন্তু তাহার বিলাসিতার বহর দেখিলে বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া যাইতে হয়। সে

সাত আট টাকার কমে কখন জুতা খরিদ করে না। আর তাহার পোষাকেরই বা বাহার কত! শুধু কি তাই? মদের আড্ডার সে একজন নিয়মিত মেম্বর; আর সর্ব্বোপরি রাত্রি-বেড়ান রোগ তাহার অতি প্রবল। এরূপ লোক হয় চুরী করে, নয় আকণ্ঠ ঋণে নিমজ্জিত হয়। আমি জানি, এই দুইটীর কোনটী হইতেই সে মুক্ত নহে। এদিকে বাড়ীতে তাহার বিধবা মা খাইতে পান না; অতিকষ্টে পৈতা-বিক্রয়লব্ধ অর্থে বিধবা কোনরূপে জীবনধারণ করেন। বিস্ময়ের বিষয় নহে কি? স্নেহের পুত্তলী মাকে আমার এমন বানরের হস্তে সমর্পণ করিতে প্রাণে দারুণ ব্যথা বাজিবে না কি? আমার মনে হয়, ইহার পরিবর্ত্তে মাকে আমার গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলাই সঙ্গত।

অপরাজিতার পাত্রের জন্য অন্যত্র অনুসন্ধান করিতে যাওয়া নিষ্প্রয়োজন। আমাদের হরিদাসই অপরাজিতার উপযুক্ত পাত্র। অপরাজিতার সহিত বিবাহ না হইলে হরিদাসের জীবন ব্যর্থ হইয়া যাইবে, আর অপরাজিতাও যে হরিদাসের অনুরাগিণী, তাহা আমি বেশ ভালরূপেই লক্ষ্য করিয়াছি; পূজনীয়া বউ দিদিরও যে ইহা অবিদিত নাই, তাহাও বিশেষরূপেই আমার জানা আছে। সুতরাং অপরাজিতাকে সুখী করাই যদি আপনার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে অবিলম্বে হরিদাসের সহিত সম্বন্ধ করিয়া

ফেলাই কর্ত্তব্য। অতঃপর এ সম্বন্ধে আপনার যাহা অভিমত হয় তাহা ফেরৎ ডাকে জানাইবেন।

বাবা, মা, আপনি ও বউদিদি আমার অসংখ্য প্রণাম জানিবেন এবং অপরাজিতা মাকে আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ দিবেন। বাসাস্থ আর আর সকলের সহিত আমি এখানে শারীরিক ভাল আছি। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি।

আপনার স্নেহের—বিজয়।

কয়েক দিনের মধ্যেই দাদার নিকট হইতে ইহার প্রত্যুত্তর পাইলাম। তিনি লিখিলেন:—

"স্নেহের বিজয়!

তোমার পত্র পাইয়া সকল কথা পিতৃদেবকে বলিলাম। দুর্ভাগ্যের বিষয়, তিনি তোমার কথা কিছুতেই কাণে তুলিলেন না। হরিদাসের সহিত অপরাজিতার সম্বন্ধ করিতে তিনি একেবারেই অনিচ্ছুক। স্পষ্টই তিনি বলিলেন,—"হরিদাস মাসিক পত্রের আপিসে চাকুরী করিয়া ৮০৲ টাকা বেতন পায় সত্য, কিন্তু সে কুলীন নহে। হীনবংশে কন্যাসম্প্রদান করিয়া বংশমর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিবার অধিকার আমাদের কাহারও নাই; সুতরাং হরিদাসের সহিত অপরাজিতার বিবাহ হওয়া অসম্ভব।" পিতৃদেবের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ আমি কেমন করিয়া করিব? এখন

অনিচ্ছাসত্বেও বিমলকুমারের সহিতই অপরাজিতার সম্বন্ধ স্থির করা হইয়াছে এবং গতকল্য পত্র পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে।

আগামী মাসের ১২ই তারিখ শুভবিবাহের দিন নির্দ্দিষ্ট হইল। তুমি যত সত্বর পার বাড়ী আসিবে। অত্রস্থ কুশল।" ইতি

আঃ—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দাদার পত্রের উত্তরে আমি তাঁহাকে লিখিয়া দিলাম,—"অপরাজিতাকে বিবাহের নামে জবাই করা হইতেছে। এ দৃশ্য আমি স্বচক্ষে দেখিতে পারিব না; সুতরাং আমাকে বাড়ী যাইবার জন্য আর পীড়াপীড়ি করিবেন না, শ্রীচরণে ইহাই আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ।" দাদাও আমার মানসিক কষ্ট বুঝিতে পারিয়া বাড়ী যাইবার জন্য আর আমাকে পীড়াপীড়ি করিলেন না।

* * *

যেদিন অপরাজিতার বাসী-বিবাহ, সেইদিন প্রাতে নয় ঘটিকার সময় আমি দাদার নিকট হইতে একটী জরুরি টেলিগ্রাম

পাইলাম ;—"অপরাজিতার জীবনের আশা নাই ; অবিলম্বে বাড়ী আসিবে।" টেলিগ্রাম পড়িয়া আমি চক্ষে অন্ধকার দেখিলাম। আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল। নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। সবলে হৃৎপিণ্ড চাপিয়া ধরিয়া আমি কাতরকণ্ঠে ডাকিলাম, 'ভগবান্! একি করিলে ?'

নয়টা পনর মিনিটে নেপালগঞ্জ হইতে ট্রেণ ছাড়ে। আমি আমার লগেজগুলিও গুছাইয়া লইবার অবকাশ পাইলাম না। গৃহস্বামীকে সেগুলি পরে পাঠাইয়া দিতে অনুরোধ করিয়া আমি তাঁহাদের নিকট বিদায় লইয়া তাড়াতাড়ি ষ্টেশনে যাইয়া ট্রেণে উঠিলাম ; উঠিবামাত্র ট্রেণ খুলিয়া দিল ; আর এক সেকেণ্ড বিলম্ব হইলে আমি সে ট্রেণ ধরিতে পারিতাম না।

হরিৎ শস্যক্ষেত্রপূর্ণ সুবিস্তৃত প্রান্তর মধ্য দিয়া বাষ্পীয় শকট দ্রুতবেগে ছুটিতে লাগিল ; দূরে হিমালয় পর্ব্বতের তুষারশুভ্র শৃঙ্গগুলি দিকচক্রবালের কোলে একে একে ডুবিয়া যাইতে লাগিল। আমি একান্ত দুঃখভারাক্রান্তহৃদয়ে একদৃষ্টে সেইদিকে চাহিয়া রহিলাম।

কত বড় বড় ষ্টেশনে গাড়ী থামিল। যাত্রীর ভীড়াভিড়ি, গাড়ীর হুড়াহুড়ি, ফেরিওয়ালার চীৎকার—এ সকল আমি লক্ষ্য করিয়াও করিলাম না। পৃথিবীর কোন সৌন্দর্য্যই আমার নিকট

সুন্দর বা প্রীতিপ্রদ বলিয়া বোধ হইতেছিল না। এক এক সেকেণ্ড সময় আমার নিকট এক বৎসর বলিয়া মনে হইতেছিল। কখন আমি বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইব, সেই চিন্তায় আকুল হইতেছিলাম।

দুই দিন দুই রাত্রি রেলগাড়ীতে সহনাতীত যন্ত্রণা ভোগ করিয়া তৃতীয় দিনের প্রত্যূষে আমি রংপুর ষ্টেশনে অবতীর্ণ হইলাম এবং তৎক্ষণাৎ একখানি ঠিকা গাড়ী করিয়া বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলাম। কয়েক মিনিটের মধ্যেই গাড়ী আমাদের বাড়ীর দ্বারদেশে উপস্থিত হইল; তারপর গাড়ী হইতে নামিয়া মাত্র কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াছি, এমন সময়ে দাদার সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমাকে দেখিয়াই তিনি ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। বুঝিলাম, সব ফুরাইয়া গিয়াছে। সহসা চক্ষে অন্ধকার দেখিলাম; হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া যেন বন্ধ হইয়া আসিল; আমি সেইখানেই বজ্রাহতের ন্যায় মাটীর উপর বসিয়া পড়িলাম।

একে একে সকল কথাই শুনিলাম। বাসরঘরেই শেষরাত্রে মার আমার কলেরা হইয়াছিল; ব্যারামের প্রথম অবস্থাতেই আমার নিকট টেলিগ্রাম করা হয়; রংপুরের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক-গণও কিছুই করিতে পারেন নাই—দুই তিন ঘণ্টার মধ্যেই সমস্ত

শেষ হইয়া যায়। আর শুনিলাম, কোন অবস্থাতেই তাহার জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য হয় নাই, আমার সঙ্গে দেখা হইল না বলিয়া সে পুনঃপুনঃ আক্ষেপ করিয়াছে, এবং বৌদিদিকে নির্জ্জনে বলিয়া গিয়াছে, 'একটা মদ্যাসক্ত লম্পটের হাতে পড়িতে হইত বলিয়া সে এ সংসার হইতে বিদায় লইয়া যাইতেছে; রোগ তাহার মনের; ডাক্তার কবিরাজের সাধ্য নাই যে, তাহাকে বাঁচাইতে পারে।'

হায়! হায়! পরমেশ্বর একি করিলে; আর যে সহ্য হয় না প্রভু! মর্ম্মের প্রত্যেক তন্ত্রী যে আজ বেদনায় বাজিয়া উঠিতেছে; যন্ত্রণায় হৃদয় বিদীর্ণ হইতে চাহিতেছে। স্নেহের পুত্তলী মাকে আমার একবার শেষ দেখাও দেখিতে পাইলাম না। কোন্ নিষ্ঠুর তাহাকে এ পৃথিবী হইতে হরণ করিল? হায়, সে কি নির্দ্দয়, কি পাষণ্ড! এমন তীব্র ব্যথা, এমন সহনাতীত যন্ত্রণা আমি আর কখনও পাই নাই।

বাড়ী আসিয়াছি শুনিয়া হরিদাস আমাকে দেখিবার জন্য ছুটিয়া আসিল। তাহাকে দেখিয়া আমার তীব্র শোকের বন্যা আরও প্রবল বেগে ছুটিতে লাগিল। সত্য সত্যই আমি চোখের জল সংবরণ করিতে পারিলাম না; বালকের ন্যায় কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিলাম। হরিদাস আমাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিল,

"কাতর হইও না; সমস্তই বিধিলিপি।" বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার গলা ধরিয়া কাঁদিয়া আমি আমার হৃদয়ের ভার অনেকটা লঘু করিলাম।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বিক্ষুব্ধ হৃদয়কে শান্ত করিবার জন্য হরিদাসের পরামর্শে কন্যা-শোকাতুরা বউদিদিকে লইয়া দেশ ভ্রমণের আয়োজন করিলাম। স্থির হইল হরিদাসও আমাদের সঙ্গে যাইবে।

যাইবার দুই একদিন পূর্ব্বে দাদা আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "বিজয়! অপরাজিতা তো অকালে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। এইবার তোর একটা বিবাহ দিয়া আমি অপরাজিতার শোক কতকটা বিস্মৃত হইতে চেষ্টা করিব।" আমি অত্যন্ত সঙ্কুচিতভাবে বলিলাম,—"দাদা! আপনার আদেশ অমান্য করিবার অধিকার আমার নাই; কিন্তু এই শোকের সময় বিবাহের প্রসঙ্গ ভাল লাগিবে কি? এতশীঘ্র অপরাজিতার শোক ভুলিয়া গিয়া আমি কোন্ প্রাণে নবপরিণীতা পত্নীকে

লইয়া বিলাসের স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিব?” আমার এই প্রত্যুত্তর শুনিয়া দাদা আর বেশী কিছু বলিলেন না।

আশ্বিনের দেবীপক্ষের ষষ্ঠীর দিন আমরা ভারতের পবিত্র তীর্থ প্রভাসক্ষেত্রে যাত্রা করিলাম। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র তাঁহার পুণ্যপদরজপূত এই প্রভাসক্ষেত্র দর্শন করিয়া আমরা মনে যার পর নাই শান্তিলাভ করিলাম।

মহানবমীর চন্দ্রকরোজ্জ্বল নিশায় আমরা সমুদ্রতটে প্রভাসের ব্রাহ্মণগণের কৃত হোমক্রিয়া দর্শন করিলাম। পৌরহিত্যে নিযুক্ত ব্রাহ্মণগণকে দেখিয়া মনে বড়ই ভক্তির উদ্রেক হইল। কি সুন্দর সৌম্য ব্রাহ্মণ-মূর্ত্তি। প্রভাসের এই হোমের দৃশ্য একবার যিনি দেখিবেন, জীবনে তিনি কখন তাহা বিস্মৃত হইতে পারিবেন না।

তটভূমিতে বালুকারাশির উপর এই হোমের দৃশ্য, আর সম্মুখে অনন্ত প্রসারিত অনন্ত সুন্দর সুনীল মহাসমুদ্র। সেই মহাসিন্ধুর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া চাহিয়া আমি মনে মনে বলিলাম,—“হে বিরাট্, হে বিচিত্র রত্নাকর, তোমার চিরগম্ভীর গর্জ্জন, অশ্রান্ত জলোচ্ছ্বাস, ফেনিল উর্ম্মিমালা, আলোকোজ্জ্বল-দিগন্তবিস্তৃত নীলিমারাশির বিচিত্র বর্ণবিন্যাস দেখিতে দেখিতে কত শোকার্ত্তের হৃদয় প্রিয়জন-বিরহের বেদনা, জ্বালা বিস্মৃত

হইয়া যায়। আমার এই শোকভারাক্রান্ত হৃদয়ে তুমি সান্ত্বনা-দান করিবে না কি ?"

সোমনাথ, দ্বারকা, প্রভাস প্রভৃতি পবিত্র তীর্থ সকল দর্শন করিয়া পুণ্যধাম জগন্নাথক্ষেত্রের পথে আমরা দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। কন্যাশোকাতুরা বউদিদি দেশভ্রমণ ও তীর্থ-পর্য্যটনে তাঁহার অসহ্য শোকে অনেকটা শান্তিলাভ করিয়াছিলেন। আমিও যে কতকটা আশ্বস্ত না হইয়াছিলাম, এমন কথা বলিতে পারি না। কিন্তু হরিদাসের মনের মধ্যে যে চিতাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল, প্রশান্ত মহাসাগরের অপরিমেয় সলিল-রাশিও বুঝি তাহা নির্ব্বাপন করিতে অসমর্থ। তীর্থ পর্য্যটনেও সে কিছুমাত্র শান্তিলাভ করিতে পারিল না। দেশে ফিরিবার কালে সে আমাকে স্পষ্টই বলিল, যে, আমাদিগকে বাড়ী পৌছিয়া দিয়াই সে সকলের নিকট চিরবিদায় গ্রহণ করিবে, কিন্তু হায়! মূর্খ আমি তাহার কথার মর্ম্ম মোটেই বুঝিতে পারিলাম না।

পরদিন বেলা প্রহর খানেকের সময় আমি বাবার কাছে বসিয়া তীর্থভ্রমণের গল্প করিতেছি, এমন সময় আমার প্রিয় ভৃত্য রামহরি হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া আমাকে বলিল,—"ছোট্ট বাবু বড় আশ্চর্য্য কথা! শুনেছেন আপনি ?" আমি সাগ্রহে বলিলাম,—"কি রে রামহরি, কি হইয়াছে, তুই অমন করিয়া

হাঁপাইতেছিস্ কেন?" রামহরি বিস্ময়ভরে বলিল,—"আপনি শুনেন নাই? এখনও হরিদাসবাবুকে খুঁজে যে পাওয়া যাচ্ছে না; গেল রাত্রে কাকেও কিছু না ব'লে তিনি কোথায় চলে গিয়েছেন। আহা ওঁর 'মার যদি কান্না দেখেন বাবু! শুন্‌লে পাষাণও বুঝি ফেটে যায়!" শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম, বাবাকে ব'ললাম আপনি বসুন। আমি জেনে আসি, ব্যাপারখানা কি। তারপর রুদ্ধনিশ্বাসে হরিদাসের বাড়ীর দিকে ছুটিলাম। সেখানে পৌঁছিয়াই যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহা বর্ণনাতীত। হরিদাসের বিধবা মা পাগলের মত হইয়া গিয়াছেন। চক্ষু শুষ্ক ও কোটরগত, মুখ পাংশুবর্ণ, গলার স্বর সম্পূর্ণ বসিয়া গিয়াছে; পরিধানের বসন দেহ হইতে খসিয়া পড়িতেছে; অথচ সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নাই; কেবল যাহাকে দেখিতেছেন তাহাকেই বলিতেছেন, 'বাবা, আমার হরিদাসকে দেখেছ? কখন সে বাড়ী ফিরে আস্‌বে?' আমি যাইবামাত্র আমাকেও ঠিক এই প্রশ্ন করিলেন। আমিও সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিলাম,—"হাঁ আমি এক্ষুনি যে তাকে দেখে এলাম, একটি সাজি নিয়ে পদ্মবিলের দিকে যাচ্ছে; আপনি পদ্মফুল দিয়ে পূজা করতে ভালবাসেন কি না? তাই আপনার জন্য পদ্মফুল আনতে গিয়েছে। আপনি ভাবছেন কেন? সে এই এল বলে।

আপনি চট করে নেয়ে ফেলুন ত ; সে পদ্মফুল আন্‌লেই আপনি পূজায় বসে যাবেন।" বিধবা তখন প্রকৃতিস্থ ছিলেন না বলিয়াই বোধহয় আমার কথায় হঠাৎ বিশ্বাস করিয়া ফেলিলেন।" বলিলেন, 'কিন্তু এখনও শিব গড়ান হয়নি যে ; আগেই নাইব কি ?' আমি বলিলাম, "আপনি আগে নেয়ে নিন ; তারপর আপনি চন্দন ঘসতে লেগে যাবেন, আমি ততক্ষণে শিব গড়ান সারা করে দেব।" বৃদ্ধা সম্মত হইলেন। আমি তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্য হইতে খানিকটা তিল তৈল আনিয়া তাঁহার মাথায় ঘসিয়া দিলাম এবং আলনার উপর হইতে তাঁহার তসরের ধূতি ও একখানা গামছা বাহির করিয়া আনিয়া তাঁহাকে পুষ্করিণীর ঘাটে লইয়া গেলাম ও পুকুরের মধ্যে নামাইয়া স্নান করাইয়া দিলাম। স্নান শেষ হইলে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করাইয়া তাঁহাকে বাড়ীতে আনিলাম, তারপর তিনি চন্দন ঘসিতে লাগিলেন, আমি শিব গড়ান শেষ করিয়া সকালের যে ফুল তোলা ছিল, তাহাই দিয়া সজ নৈবেদ্য করিয়া দিয়া তাঁহাকে পূজায় বসিতে বলিলাম। কিন্তু তিনি বলিলেন—"পদ্মফুল না এলে আমি পূজায় বসিব না।" আমি তখন বলিলাম—"হরিদাস বলিয়া পাঠাইয়াছে, এখানকার পদ্মবিলে পদ্ম পাওয়া গেল না, সে পদ্মের জন্য নওগাঁর পদ্মপুকুরে যাইতেছে, ফিরিয়া আসিতে দুই তিন দিন লাগিতেও পারে। আপনি পূজা

সারিয়া হবিষ্য করিয়া লউন। আমি এমনভাবে কথাগুলি বলিলাম যে, বিধবা তাহাতেই বিশ্বাস করিলেন। পূজা শেষ করিয়া যৎসামান্য কিছু রাঁধিয়া তিনি হবিষ্য শেষ করিয়া লইলে আমি বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম। তারপর হরিদাসের জন্য চারিদিকে বহু অনুসন্ধান করিলাম; শেষে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন পর্য্যন্ত দিলাম; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না—কোন স্থানেই তাহার খোঁজ-খবর পাওয়া গেল না।

হরিদাসের মাকে লইয়া আমার এক নূতন জ্বালা হইয়াছে। মিথ্যা স্তোকবাক্য তাঁহার কাছে বেশী দিন খাটিল না। পুত্রের অদর্শনে তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না—শীঘ্রই তাঁহার শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। এখন হরিদাসের হইয়া আমাকেই তাঁহার সমস্ত কাজ করিতে হইতেছে। নিত্য তাঁহার ফুল তুলিয়া শিব গড়াইয়া দি। তারপর স্নানের সময় হইলে মাথায় তেল মাখাইয়া দিয়া সঙ্গে করিয়া পুষ্করিণীতে লইয়া গিয়া নিজেও স্নান করি, তাঁহাকেও স্নান করাই। স্নান শেষ হইলে বাড়িতে আনিয়া তাঁহাকে পূজা ও হবিষ্য করাইয়া তবে নিজে বাড়ীতে ফিরি। সন্ধ্যার সময় আবার যাইয়া তাঁহাকে সন্ধ্যা আহ্নিক করাইয়া রাত্রের জন্য কিঞ্চিৎ দুধ ও ফলমূল আহার করাইয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া পরে বাড়ীতে

আসিয়া নিজের আহারাদি শেষ করি। এমনি ভাবে দিন কাটিতেছে বটে, কিন্তু হরিদাসের অভাবে তাহার মাতার সঙ্গে সঙ্গে আমিও জীবন্মৃত হইয়া গিয়াছি।

* * *

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। মহাপূজার প্রাক্কালে এবার আবার দেশভ্রমণে বহির্গত হইলাম। এবার দাদা, বাবা এবং বউদিদি ত আসিয়াছেনই, হরিদাসের মাকেও সঙ্গে আনা হইয়াছে। স্থির হইয়াছে, মহানবমীর দিন শ্রীশ্রীভবানীপুরে দেবী অপর্ণার দর্শন করিয়া সকলে মানবজন্ম সফল করিব। কামাখ্যা, বিন্ধ্যাচল, তারাপীঠ, কালীঘাট ও চন্দ্রশেখর দর্শন করিয়া ষষ্ঠীর দিন প্রাতে আমরা আত্রাইঘাট ষ্টেশনে অবতরণ করিলাম। এখান হইতে আত্রাই বহিয়া নৌকা পথে শ্রীশ্রীভবানীপুরে যাইতে হইবে। একখানি বড় পানসী নৌকা ভাড়া করা হইল। তারপর নদীতীরে রন্ধন ও আহারাদি শেষ করিয়া বেলা প্রায় দশ ঘটিকার সময় আমরা নৌকায় উঠিলাম। আত্রাই বহিয়া নৌকা আস্তে

আস্তে পূর্ব্বদিকে চলিতে লাগিল। দাদা ও বাবা একসঙ্গে বসিয়া গল্প করিতেছেন, আর একটু দূরে বসিয়া আমি ও বউদিদি কখনও গল্প করিতেছি, কখনও বা আত্রেয়ীর তীরশোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছি এবং হরিদাসের মাকেও সেই সব শোভা দেখাইতেছি। এমনিভাবে চলিতে চলিতে বেলা প্রায় চারি ঘটিকার সময় আমরা নদীর উত্তর তীরে একটি বৃহৎ তোরণের উপর বড় বড় রক্তাক্ষরে লেখা দেখিতে পাইলাম,—"অপরাজিতা আশ্রম।" তন্মুহূর্ত্তেই আমি চীৎকার করিয়া মাঝিকে নৌকা বাঁধিতে বলিলাম।" মাঝি তাহাই করিল। তারপর আমি একলম্ফে তীরে অবতরণ করিয়া তোরণের মধ্য দিয়া বিদ্যুদ্বেগে অগ্রসর হইতেছি, এমন সময় একজন খদ্দর পরিহিত যুবক আমাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"মহাশয় কোথায় যাইতেছেন? সাম্‌নের সইনবোর্ডে কি লেখা আছে দেখিয়াছেন কি?" তখন যেন আমার হুঁস হইল; সম্মুখে চাহিয়া দেখিলাম, সাইন বোর্ডে লেখা আছে, "অনুমতি বিনা প্রবেশ নিষেধ।" যুবককে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"এ আশ্রম কাহার এবং কিসের? ভিতরে যাইতে হইলে কাহার অনুমতি লইতে হইবে?" যুবক বলিল—"ব্রহ্মচারী হরিদাস এ আশ্রমের অধ্যক্ষ; এখানে প্রায় দুই শত ছাত্র তপস্যারত হইয়া দেশসেবা-ব্রত লইয়া নানা বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতেছে। প্রবেশের

অনুমতি আমিই দি; কিন্তু আপনার প্রয়োজন কি বলুন?" আমি বলিলাম, "আমি অধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করিতে চাই।" প্রশ্ন হইল—"মহাশয়ের নাম?"—উত্তর—"বিজয়কুমার বন্দ্যো-পাধ্যায়।" "নিবাস?"—"রংপুর।" যুবক বলিল, "আপনি একটু দাঁড়ান, আমি এখনই অধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতেছি।" এই বলিয়া সে তীরবেগে আশ্রমের মধ্যে চলিয়া গেল। মিনিট দুই তিন পরেই একজন গৈরিক বর্ণের খদ্দর পরিহিত দীর্ঘকেশ ও দাড়িগোঁফ-শোভিত ব্রহ্মচারীবেশী পুরুষ বাহির হইয়া আসিলেন;—আসিয়াই তিনি বুকের মধ্যে আমাকে টানিয়া লইলেন। বলা বাহুল্য, ইনিই আশ্রমের অধ্যক্ষ—আমার প্রাণাধিক বন্ধু হরিদাস। হরিদাসকে পাইয়া আমি আনন্দে আত্মহারা হইলাম। দুইজনে বহুক্ষণ আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া রহিলাম—ছাড়িতে আর যেন ইচ্ছা হয় না। অনেকক্ষণ এইভাবে স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া বলিলাম,—"নৌকার উপরে সকলেই আছেন হরিদাস—তোমার মাও আছেন।" হরিদাস দৌড়িয়া নৌকার উপরে যাইতেছিল, আমি তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া রাখিলাম। বলিলাম—"হঠাৎ দেখা হইলে আনন্দের আতিশয্যে বৃদ্ধার প্রাণবিয়োগ হইতে পারে। আগে তাঁহাকে সংবাদ দি; পরে ধীরে-সুস্থে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিও।"

হরিদাস বলিল,—"তাহাই ঠিক। আমি আশ্রমে যাইয়া সকলের থাকিবার জন্য চট্ করিয়া একখানা ঘর খালি করি; তুমি উঁহাদিগকে নামাইয়া লইয়া আইস।" হরিদাস চলিয়া গেল। আমি নৌকার উপরে যাইয়া সকলকে হরিদাসের সংবাদ দিলাম। হরিদাসের মা কিন্তু একথা বিশ্বাস করিলেন না, কেবল কাঁদিতে লাগিলেন। যাহা হউক, তাঁহাদের সকলকে নামাইয়া আশ্রমের মধ্যে লইয়া গেলাম।

## সপ্তম পরিচ্ছেদ

সকলের থাকিবার ব্যবস্থা ঠিক হইলে নিভৃতে হরিদাসের সঙ্গে গল্প করিতে বসিলাম। হরিদাস বলিতে লাগিল,—"অপরাজিতা ফাঁকি দিয়া পলাইয়া গিয়া আমার যে অবস্থা করিয়া গিয়াছিল, তেমন অবস্থায় পড়িয়া সংসারে থাকা অসম্ভব। বাধ্য হইয়াই মা ও তোমাদের প্রাণে ব্যথা দিয়া সংসার ছাড়িয়া পলাই। তারপর বেড়াইতে বেড়াইতে এইস্থানে আসিয়া এখানকার প্রাকৃতিক শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হই, ও এইস্থানেই আশ্রম নির্ম্মাণ করি। এখন জীবনে শান্তি পাইয়াছি। উহা আর এখন দুর্ব্বহ বলিয়া মনে

হয় না, বরং পরম সুখে ভগবানের কাজে দিনগুলি কাটিয়া যাইতেছে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আশ্রমে অনেকগুলি ছাত্র আছে দেখিতেছি। ইহাদিগকে কি শিক্ষা দিতেছ?" হরিদাস বলিতে লাগিল;—"অপরাজিতার মৃত্যু অবশ্য তীব্র মানসিক আঘাতেরই ফল; তবু কলেরাকে উপলক্ষ্য করিয়াই তাহার মৃত্যু হয়। তাই এই কলেরার মূল কারণ যাহাতে দূর হয়, তাহারই জন্য আমি সর্ব্বস্বপণ করিয়াছি। জানি বাংলাদেশে দূষিত জলপানই এ রোগের সর্ব্বপ্রধান কারণ; এই কারণেই দেখিতে দেখিতে সোণার বাংলা ছারখার হইয়া গেল। দেশের সব লোকই যে গরীব তা নয়। শীতল পর্ণকুটীরের বদলে উষ্ণ টিনের ঘরে দেশ ছাইয়া গেল। ইহার জন্য লোকের পয়সা জুটে; অথচ ভাল পানীয় জলের জন্য ইহারা এক কপর্দ্দকও ব্যয় করিতে চায় না কেন জান? লোকের ভীষণ অজ্ঞতা। এই অজ্ঞতার সঙ্গেই আমরা লড়াই করিব। এই যে আমার আশ্রমে দুই শত ছাত্র তৈয়ার হইতেছে, শিক্ষা শেষ হইলে ইহারা গ্রামে গ্রামে প্রচারের জন্য বাহির হইবে। সকলকে বুঝাইবে যে, পানীয় জলই জীবন। টিনের ঘর না হইলেও চলে; রাস্তা ঘাট না হইলেও লোক মরে না; কিন্তু জলের বেলায় তা হয় না। বিশুদ্ধ জল না হইলে লোকের মৃত্যু অনিবার্য্য। এই যে গ্রামে গ্রামে

কলেরার প্রকোপে দেশ জনশূন্য হইয়া গেল, ইহার জন্য সরকার এবং দেশের লোক কি করিতেছে? কলেরার টীকা দিয়া কয়দিন এই মৃত্যুকে ঠেলিয়া রাখিবে?" আমি বলিলাম, "শুধু প্রচারে কিছু হয় না হরিদাস, লোকে এক কাণ দিয়া শুনে, আর কাণ দিয়া বাহির হইয়া যায়। মুখে যাহা বল, কাজে যদি তাহা করিয়া দেখাইতে পার, তবেই লোকে তোমাব কথা কতকটা শুনিলেও শুনিতে পারে।" হরিদাস বলিল,—"ঠিক বলিয়াছ; আমরা শুধু মুখেই প্রচার করি না। আশ্রমের নিকটবর্ত্তী গ্রামগুলিতে আমরা নিজের হাতে প্রায় একশত পুকুর ও কূপ কাটিয়া দিয়াছি। আমাদের কর্ম্মীসংখ্যা এখনও অতি অল্প, এই সংখ্যা যখন বাড়িবে, তখন আমরা লোকের কাণে শুধু মানুষ হইবার মন্ত্রই দিব না, তাহাদের হাত ধরিয়া কাজ করিতে শিখাইয়া দিব, এবং নিজেরাও সঙ্গে সঙ্গে তেমনি ভাবে কাজ করিব।" আমি হরিদাসের কথা শুনিয়া আনন্দে অধীর হইতে লাগিলাম। হরিদাস বলিতে লাগিল; "সকল কাজের মধ্যে আমার একটি বড় কাজ আছে। এই আশ্রমের উত্তর প্রান্তে একটি অপরাজিতার লতামণ্ডপ প্রস্তুত করাইয়াছি। সেই লতা-মণ্ডপের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র কৃত্রিম পাহাড়ের পাদদেশে প্রস্তর বেদীর উপর অপরাজিতার একটি পাষাণ মুর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া সযত্নে স্থাপন

করিয়াছি। সারাদিনের কর্ম্মাবসানে আশ্রমবাসী যখন নিদ্রার কোলে বিশ্রাম লয়, তখন আমি লতামণ্ডপে প্রবেশ করিয়া গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত সেই দেবীমূর্ত্তির পূজা ও ধ্যানে সময় অতিবাহিত করি। তাহার পর অতি অল্পক্ষণ মাত্র বিশ্রাম করিয়া আবার সকলের আগে শয্যাত্যাগ করিয়া উঠি। এই লতামণ্ডপে আশ্রমের অন্য কাহারও প্রবেশাধিকার নাই। চল তোমাকে আমার সেই চিরারাধ্যা দেবীমূর্ত্তি দেখাই।" এই বলিয়া হরিদাস আমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া অপরাজিতার লতামণ্ডপে প্রবেশ করিল। কি রমণীয় সেই স্থান! আমি যেন এই জ্বালা-যন্ত্রণাময় সংসার ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া কোন এক স্বর্গীয় রাজ্যে বিচরণ করিতে লাগিলাম। এদিকে হরিদাস ধীরে ধীরে পাষাণ-মূর্ত্তির সম্মুখে লইয়া গিয়া আমাকে বলিল,—"এই দেখ আমার দেবীমূর্ত্তি! তুমি হয়ত মনে করিবে, এটা আমার মস্ত ভণ্ডামী; বাহিরে সাধুর বেশ, আর অন্তরে অবিরত নারীধ্যান ও নারী-জ্ঞান। কিন্তু বিজয়, তোমাকে সত্য বলিতেছি, এই দেবীমূর্ত্তির কাছে আসিলেই আমার কর্ম্মাবসন্ন হৃদয় আবার নবীন তেজ ও নবীন উদ্যমে ভরিয়া উঠে। এই পাষাণ প্রতিমা আমার নিকট জাগ্রত বলিয়া বোধ হয়। মনে হয় যেন অপরাজিতার মুক্ত-আত্মা এই মূর্ত্তির মধ্যে থাকিয়া আমাকে কর্ম্মক্ষেত্রে সতত পথ-

প্রদর্শন করে। দেখিতেছ না প্রতিমার চক্ষুদ্বয় কেমন উজ্জ্বল—মুখে কেমন স্বর্গীয় প্রশান্ত হাসি—একে কি তোমার পাষাণমূর্ত্তি বলিয়া বোধ হয়?" বলিতে বলিতে হরিদাসের চক্ষু দুইটি বুজিয়া আসিল, পা দুইখানা কাঁপিতে লাগিল;—আমি আস্তে আস্তে ধরিয়া তাহাকে মাটীর উপর শোয়াইয়া দিলাম। একটু পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া সে বলিল;—"চল; এ মূর্ত্তির কাছে আসিলে আমি সংসার ভুলিয়া যাই। এটা আমার স্বর্গ। কর্ম্মের মাঝে এখানে আসিলে সব দিক পণ্ড হইবে", এই বলিয়া আমার হাত ধরিয়া বাহির হইয়া আসিল।

* * * *

পরদিন প্রাতে হরিদাস তাহার মার সঙ্গে দেখা করিল। বৃদ্ধা তাহার হারাণ মাণিককে পাইয়া যেরূপ আনন্দিতা হইল, যাঁহারা নিজে কখন তেমন অবস্থায় পড়িয়াছেন, তাঁহারাই কেবল উহা বুঝিতে পারিবেন। সমস্ত দিন মহানন্দে কাটিয়া গেল।

হরিদাসকে সঙ্গে লইয়া মহানবমীর দিন অপর্ণা মাতার দর্শন ও পূজা করিয়া ধন্য হইলাম। তিন দিন সেই মহাতীর্থে বাস করিয়া যে আনন্দ লাভ করিলাম, পৃথিবীর সারা ধনঐশ্বর্য্যও তাহার নিকট অতি তুচ্ছ। তিনটী দিন এই স্বর্গভোগের পর পুনরায় সকলে আত্রেয়ী তীরে অপরাজিতা আশ্রমে ফিরিয়া আসিলাম।

হরিদাসের কাজে আর বিঘ্ন উৎপাদন করা উচিত নয় মনে করিয়া আমরা দেশে ফিরিবার প্রস্তাব করিলাম। কিন্তু তাহার মাকে লইয়া কি হইবে? তাঁহাকে এইখানেই রাখিয়া যাওয়া হইবে, না দেশেই লইয়া যাওয়া হইবে? আর বৃদ্ধা এতকালের দুঃখ ভোগের পর তাঁহার হারাণ মাণিককে পাইয়া এত শীঘ্র তাহাকে ছাড়িয়া যাইতেই বা চাহিবেন কেন? এই বিষয় লইয়া হরিদাসের সঙ্গে আমার আলোচনা হইতে লাগিল। হরিদাস আমাকে বলিল;—"ভাই বিজয়! একবার যখন সংসারের মায়া কাটাইয়া আসিয়াছি, তখন আবার কেন আমাকে তাহারই মধ্যে আনিয়া ফেলিবে? মার এ বয়সে তাঁকে কাছে রাখিয়া সেবা শুশ্রূষা করা যে সঙ্গত, তা অস্বীকার করিনা, কিন্তু তাহা করিতে হইলে আমার সমস্ত সুখস্বপ্ন অচিরে ভাঙ্গিয়া যাইবে। এক মায়ের সেবার জন্য যদি লক্ষ লক্ষ মায়ের সেবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হই, তবে সেটা কি ঘোর দুর্ভাগ্যের কথা নহে? জানি এর জন্য অনেকেই আমাকে উপহাস করিবে; কিন্তু কোন্ মানুষের দুর্ব্বলতা না আছে ভাই? বিশেষ তুমি যদি আমার হইয়া মার সেবা শুশ্রূষা কর, তবেত অনায়াসেই আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারি।" আমি বলিলাম,—"আমার দ্বারা যতটা সম্ভব, তার ত্রুটী হইবেনা; এত দিন যে ভাবে তাঁহার সেবা করিয়াছি,

যতদিন বাঁচিয়া থাকিব, ততদিন ঠিক তেমিভাবেই করিতে থাকিব।” হরিদাস গদ্গদ স্বরে বলিল ;— “এ কয়েক বৎসর তুমিই আমার অভাব পূর্ণ করিয়াছ, তোমার সেবা না পাইলে মা কখনই বাঁচিয়া থাকিতেন না। সুতরাং তোমাকে আর বেশী কি বলিব, যাহা ভাল হয় করিও ভাই।”

হরিদাসকে ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা হয় না, কিন্তু তবু যাইতে হইল। ক্রমে বিদায়ের সময় উপস্থিত হইল। ভাবিয়াছিলাম, মা ও সন্তানের বিদায়দৃশ্য বড়ই মর্ম্মস্পর্শী হইবে ; কিন্তু আমার আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক প্রমাণিত হইল। হরিদাসের মা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ভাবে কিছুমাত্র শোককাতর না হইয়া মমতাপূর্ণ মধুরস্বরে তাহার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। বলিলেন ;—“বাছা ! তুই দেশকে মা বলিয়া চিনিয়াছিস্ ; এর বাড়া গর্ব্ব আর আমার কি আছে ? এমনি ভাবে জীবনের সবখানি দিয়া তাঁর সেবা কর।” হরিদাস প্রথমে তার মার ও পরে অন্যান্য সকলের পদধূলি লইয়া পরিশেষে আমার সঙ্গে কোলাকুলি করিল। আমি আর মায়া বাড়াইবনা ভাবিয়া একরকম জোর করিয়াই নৌকার উপরে চড়িলাম। আমার ইঙ্গিতে মাঝি তখনই নৌকা খুলিয়া দিল।

বসিয়া থাকিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু পারিলাম না; মাথার মধ্যে বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরিতে লাগিল;—তাড়াতাড়ি যাইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলাম। মনে হইতে লাগিল, যেন স্বর্গরাজ্য হইতে পৃথিবীর নিম্নে কোন এক অতল গহ্বরে চলিয়া যাইতেছি। এক একবার আত্রেয়ী তীরের সেই পরম রমণীয় আশ্রমের দৃশ্য চক্ষের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিতেছিল, আবার পরক্ষণেই সমস্ত মিলাইয়া গিয়া সারা জগৎটাই অন্ধকারময় দেখাইতেছিল। আমার এই যাতনা দেখিয়াই বুঝি প্রকৃতি দেবী কৃপা করিলেন—শীঘ্রই আমি নিদ্রার কোলে অচৈতন্য হইয়া পড়িলাম। কতক্ষণ এইভাবে ছিলাম জানিনা; তারপর কে ঠেলা দিয়া আমার ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিল। দেখিলাম, বউদিদি ডাকিয়া বলিতেছেন,—"ঠাকুর পো! উঠ, আত্রাই ঘাট ষ্টেশন আসিয়াছে; নৌকা হইতে, নামিবার উদ্যোগ কর।" আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলাম।

— —

# পূজার অর্ঘ্য

## অমিয়কুমার

### প্রথম পরিচ্ছেদ।

বর্ষাকাল, আকাশ গাঢ় মেঘে আচ্ছন্ন; সারাদিন টিপি-টিপি বৃষ্টি হইতেছে। স্কুলের কাজ সারিয়া সবেমাত্র বাসায় ফিরিয়া হাতমুখ ধুইবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় তারঘরের হরকরা আসিয়া আমার হাতে একটী জরুরি টেলিগ্রাম দিয়া চলিয়া গেল। তাড়াতাড়ি টেলিগ্রামের আবরণটা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া পড়িয়া দেখিলাম; তাহাতে লিখিত ছিল;—

"অমিয় কুমারের জীবনের আশা নাই; টেলিগ্রাম পাইবা-মাত্র বাড়ী আসিবে।"

"অমিয়কুমার আমার শিশুপুত্র—আমি টেলিগ্রাম পড়িয়া বজ্রাহতের ন্যায় বসিয়া পড়িলাম। তারপর হৃদয়ের ভার একটু লঘু হইবামাত্র আমি আমাদের স্কুলের সম্পাদক নীল-মাধব বাবুর বাসার দিকে ছুটিলাম। নীলমাধব বাবু অত্যন্ত সহৃদয় ভদ্রলোক; বহুদিন অবধি তাঁহার অধীনে শিক্ষকের কাজ করিতেছি, কিন্তু কখনও কোন বিষয়ে তাঁহার নিকট

অযথা নিরাশ হইতে হয় নাই। বলা বাহুল্য, তিনি আমার অবস্থা শুনিয়া আপাততঃ পনের দিনের ছুটী দিলেন, এবং দরকার হইলে পরে আরও দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। আমি আবার একরকম দৌড়িয়াই বাসায় ফিরিলাম, এবং তাড়াতাড়ি সামান্য জলযোগ করিয়া ষ্টেশনে যাইয়া ট্রেণে উঠিলাম।

যথাসময়ে বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া আমার শয়ন গৃহে প্রবেশ করিতেই দেখিলাম, মেজের উপরে আমার শিশুপুত্র শয্যায় পড়িয়া বিকারের ঘোরে ছট্‌ফট্ করিতেছে। গ্রাম্য কবিরাজ বৃদ্ধ রামজীবন দাস তাহার নাড়ী পরীক্ষা করিতেছে, এবং শয্যার চারিপার্শ্বে আমার আত্মীয়-স্বজনগণ নীরবে বিষণ্ণবদনে বসিয়া আছে। আমি নিঃশব্দে শিশুর শয্যাপ্রান্তে উপবেশন করিলাম। অমিয়কুমারের তাদৃশ অবস্থা দেখিয়া আমার অন্তঃকরণ দুঃখে ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল; কিন্তু মলিনবসনা, আহারনিদ্রা-বিহীনা শিশুর হতভাগিনী জননীর কথা মনে করিয়া আমি বড় কষ্টে হৃদয়বেগ সংবরণ করিলাম। কেন না, আমিই যদি অধীর হইয়া পড়ি, তবে সে একেবারে সান্ত্বনার অতীত হইয়া পড়িবে। ধীরে ধীরে আমি কবিরাজকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেমন অবস্থা এখন দেখিতেছ খুড়া?" বৃদ্ধ রামজীবন দাস মাথা নাড়িয়া বলিল, "তুমি এখন ঠাণ্ডা হও

যোগেন, পরে ধীরে-সুস্থে সকল কথা শুনিও।" কবিরাজ আমাকে স্পষ্ট করিয়া কিছু না বলিলেও আমি তাহার মুখের ভাব দেখিয়া অবস্থা বড় ভাল বলিয়া বোধ করিলাম না।

যাইবার পূর্ব্বে রামজীবন দাস আমাকে নির্জ্জনে বলিয়া গেল,—"তোমরা একটু সতর্ক থাকিও যোগেন, আজিকার দিন পার পাইবে কিনা বলা যায়না। কবিরাজের কথা শুনিয়া আমি চক্ষে অন্ধকার দেখিলাম, পৃথিবী আমার নিকট মসীমলিন হইয়া গেল; আমি দুই হস্তে আমার বক্ষঃস্থল চাপিয়া ধরিয়া মাটীর উপর বসিয়া পড়িলাম।

অপরাহ্ণে আকাশ ঘনঘটায় আছন্ন হইল। আকাশের অবস্থা দেখিয়া সকলেই বুঝিতে পারিল, সে দিন বড় রকমের একটা দৈবদুর্য্যোগ না হইয়া যাইবেনা। প্রতিবাসীগণ যাহারা আঁসিয়াছিল, তাহাদের সকলেই নিজ নিজ গৃহে চলিয়া গেল। আমরা বাটীর চারিটি লোক—দাদা, আমি, শৈলবালা ও আমার পত্নী গৃহের দরজা জানালা রুদ্ধ করিয়া দিয়া শিশুর শয্যাপ্রান্তে উপবেশন করিলাম।

ঘনমসীলিপ্ত দূরদিগন্তের ক্রোড় হইতে ঝটিকার উন্মত্ত তরঙ্গ ছুটিয়া আসিয়া গৃহের দরজা জানালায় সজোরে আঘাত করিতে লাগিল, মধ্যে মধ্যে ভীষণ রবে বজ্রপাতের শব্দ হইয়া দারুণ

আতঙ্কে সকলকে কাঁপাইয়া তুলিতে লাগিল। সে যেন প্রকৃতির ভীষণ সংহার-মূর্ত্তি! কিন্তু ইহা অপেক্ষাও ভীষণতর অবস্থার সঙ্গে আমাদের সংগ্রাম হইতেছিল—গৃহমধ্যে ধীরে ধীরে শিশু অমিয়কুমারের জীবনগ্রন্থি টুটিয়া আসিতেছিল।

সমস্ত রাত্রি এইভাবে অতিবাহিত হইল—দুর্য্যোগের শান্তি হইল না। অবশেষে প্রভাতে অরুণোদয়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ধীরে ধীরে বালসূর্য্যের কিরণসমূহ যখন মেঘান্তরাল-পথে গ্রাম্যপ্রদেশের উপর বিস্তৃত হইয়া সিক্ত-প্রকৃতির বিষাদ-ভারাবনতবদনে ম্লান-হাস্যরেখা প্রস্ফুটিত করিল, ঠিক সেই সময়ে আমার সর্ব্বস্বধন—আমার অমূল্যনিধি শিশু অমিয়কুমারের জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। শিশুর মুখমণ্ডলে স্বর্গীয় হাস্যরেখা প্রস্ফুটিত রাখিয়া নীরবে শান্তজ্যোতিঃ নিভিয়া গেল।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া যাইবার সময়ে শিশুর জননী উহা এমন করিয়া বুকের মধ্যে চাপিয়া রাখিল যে, তাহার নিকট হইতে উহা কাড়িয়া লইতে গিয়া সকলেই একে একে হার মানিল। হতভাগিনীর মুখে কেবল একই কথা ;—"আমি আমার খোকাকে কিছুতেই লইয়া যাইতে দিব না, যদি তোমরা লইবে, আমাকেও সঙ্গে লও, আমাকে শুদ্ধ এক চিতায় পোড়াইয়া ফেল।" সকলেই যখন পরাভব মানিল, তখন আমাকেই এই অসাধ্যসাধনের জন্য অগ্রসর হইতে হইল। অন্তরে তখন আমার রাবণের চিতা জ্বলিতেছিল, কিন্তু যতদূর সম্ভব, বাহিরে আমি তাহা প্রকাশ হইতে দিলাম না। ধীরে ধীরে আমি আমার পত্নীর নিকটে যাইয়া গদগদ কণ্ঠে কহিলাম —"কমলা! একবার দাও, আমি আমার প্রাণাধিককে একবার কোলে করিয়া আমার তাপিত-বক্ষ শীতল করি।" এবার কমলা প্রতারিত হইল ; ধীরে ধীরে অমিয় কুমারকে আমার কোলে দিয়া বলিল,—"এই নাও, এইখানে বসিয়া কোলে কর কিন্তু তুমি বাছাকে আমার অন্য কোথায়ও লইয়া যাইতে

পারিবে না। আমি ইঙ্গিত করিবামাত্র দুই তিনজন যাইয়া কমলাকে ধরিয়া রহিল, এবং আমি মৃতদেহ লইয়া উর্দ্ধশ্বাসে শ্মশানের দিকে প্রস্থান করিলাম।

এদিকে যথাসময়ে চিতা সজ্জিত হইল, তারপর মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া এই অভাগা জনক শিশুর অগ্নিক্রিয়া সমাপন করিল। দেখিতে দেখিতে চিতা ধূ ধূ জ্বলিয়া উঠিল, দেখিতে দেখিতে স্বর্গের সুষমারাশি ভস্মাবশেষে পরিণত হইল।

আপনার কঠোর কর্ত্তব্য শেষ করিয়া পাষাণ প্রাণ লইয়া যখন গৃহে ফিরিলাম তখন দুঃখিনী কমলার অবস্থা দেখিয়া হতজ্ঞান হইতে হইল। অমিয় কুমারকে লইয়া যাইবামাত্রই সে যে মুর্চ্ছিত হইয়াছিল, এখনও তাহার সে মূর্চ্ছা ভাঙ্গে নাই! প্রাঙ্গণ হইতে অনেক কষ্টে তাহাকে বারান্দায় একখানা চৌকির উপর তুলিয়া রাখা হইয়াছে। বালিকা শৈলবালা তাহার মস্তক ও মুখে চোখে জলসেচন করিতেছে, আর একটু দূরে দাদা পাগলের মত দুই বাহুর মধ্যে মুখ করিয়া বসিয়া আছেন। আমি অনেক চেষ্টায় কমলার সংজ্ঞা উৎপাদন করিলাম বটে, কিন্তু তিনদিন তিনরাত্রি কেহ তাহাকে জলবিন্দু গ্রহণ করাইতে পারিল না।

কয়দিন পরে কমলা যখন প্রকৃতিস্থ হইল, তখন আমি তাহাকে বলিলাম, "ম্যালেরিয়া রাক্ষস আমার স্নেহের পুত্তলিকে

হরণ করিয়াছে ; এ ম্যালেরিয়ার দেশে থাকিলে কাহারও নিস্তার নাই। চল যে দেশে ম্যালেরিয়া নাই, সেই দেশে যাইব, মথুরা, বৃন্দাবন অথবা হরিদ্বারের পূণ্যক্ষেত্রে যাইয়া জীবনের অবশিষ্ট কয়টা দিন অতিবাহিত করিব।” কিন্তু কমলা দৃঢ়বাক্যে ইহাতে অসম্মতি জানাইয়া বলিল, “তা হয়না প্রিয়তম, এই রতনপুরের ধূলিকণায় আমার প্রাণাধিক বিরাজ করিতেছে। এখানকার জলে স্থলে সর্ব্বত্র আমি অমিয় কুমারের অশরীরি মূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছি। এ স্থান যে আমার মহাতীর্থ, এই মহাতীর্থের মাটীর সঙ্গে মিশিয়া যাওয়ার মত পুণ্য আর কি আছে ?” আমি বলিলাম,—“কমলা, তুমি এখন শোককাতর, তোমার মনের এই চঞ্চলাবস্থায় ভালমন্দের বিচার ঠিক সাধারণ মানুষের মত করিতে পারিবেনা। ম্যালেরিয়ার কবলে পড়িয়া তিলে তিলে দেহক্ষয় করিয়া কোন লাভ নাই। বৃথা ব্যাধির মন্দিরে আত্ম-বলিদান করিয়া কি হইবে ?” কমলা বাধা দিয়া বলিল,—“কিন্তু এই ভিটাটুকুযে আমার শ্বশুরের সাত পুরুষের বসতবাটী, তাঁদের সেই সাধের ভিটাখানিকে শেয়াল কুকুরের বাসভূমি করিয়া নিজেরা কাশী প্রয়াগে যাইয়া বিহার করিলে তাঁদের স্বর্গগত আত্মাগুলিকে কতখানি বেদনা দেওয়া হইবে, তাহা কি তুমি কখনও কল্পনা করিতে চেষ্টা করিয়াছ ?

প্রিয়তম, এখানে মরিয়াও যে সুখ, তোমার কাশী প্রয়াগ হরিদ্বারের স্বর্গভোগেও তা নাই। বিশেষ আমার অমিয় কুমারকে একা ফেলিয়া রাখিয়া আমি কোথায় যাইব?" কমলার কথায় আমার অন্তরের মধ্যস্থল হইতে কান্না বাহির হইয়া আসিতে লাগিল। কিন্তু আমি পরিষ্কার গলায় কহিলাম, "তা ঠিক কমল, কিন্তু আমার দিকেও কি একটু তাকাইবেনা? আমার অন্তরটা যে একেবারে হু—হু করিতেছে। দিন কয়েকের জন্য স্থানান্তরে না গেলে কিছুতেই আমার মনে শান্তি আসিতে পারিবে না। অন্ততঃ আমার খাতিরেও কি তোমার দিন কয়েকের জন্য আমার সঙ্গে যাওয়া উচিৎ নয়?" কমলা আবার বাধা দিয়া বলিল,—"না—এইখানেই আমায় বাছার কাছে থাকিতে দাও। তুমি একাই দিন কয়েকের জন্য ঘুরিয়া ফিরিয়া আইস।" আমি আবার বলিমাম,—"কিন্তু এই এত বড় শোকের সময় আমাকে একাকী বিদেশে পাঠাইয়া সাধ্বী স্ত্রী তুমি কেমন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে? না কমল, তা হয়না। চল আমরা দুজনেই অল্প কিছুদিনের জন্য হরিদ্বার হইতে বেড়াইয়া আসি।" কমলা এবার ধীরে ধীরে বলিল,—"তা নিতান্তই যদি না থাক, তবে চল একবার ঘুরিয়া আসি, কিন্তু বেশীদিন আমাকে বাছার কাছ ছাড়াইয়া রাখিতে পারিবে না,

তাহা তোমাকে কিন্তু আগেই বলিয়া দিতেছি।" আমি বলিলাম, "তাহাই হইবে, খুব শীঘ্রই আমরা ফিরিয়া আসিব।" কমলা অগত্যা রাজী হইয়া বলিল, "তাহা হইলে একটা ভাল দিন দেখিয়া যাত্রার তারিখ ঠিক কর।"

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তীর্থযাত্রার উদ্যোগ-আয়োজন করিতেছি, ইহার মধ্যে একদিন শেষরাত্রে দাদা হঠাৎ কলেরায় আক্রান্ত হইলেন। পল্লীগ্রামে এরূপ অবস্থায় যতদূর সম্ভব, চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা হইল, কিন্তু আমাদের সকল চেষ্টাই নিষ্ফল হইল; পরদিন বেলা একপ্রহরের সময় তিনি আমাদের মায়া মমতা ছিন্ন করিয়া দিব্যধামে চলিয়া গেলেন। তাঁহাকে হারাইয়া আমি চক্ষে অন্ধকার দেখিলাম। উপর্য্যুপরি শোকের এই ভীষণ তরঙ্গাভিঘাতে আমার দুর্ব্বল হৃদয় যেন একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল।

দশদিন যথারীতি অশৌচ পালন করিয়া একাদশ দিনে দাদার

শ্রাদ্ধক্রিয়া শেষ করিলাম, এবং পরদিন শৈলবালাকে তাহার শ্বশুরগৃহে পাঠাইয়া দিয়া আমি কমলাকে সঙ্গে লইয়া হরিদ্বারে রওনা হইলাম।

হরিদ্বারে আসিবার প্রায় একমাস পরে আমি আমার প্রতিবাসী যজ্ঞেশ্বর সরকারের নিকট হইতে নিম্নলিখিতরূপ একখানি পত্র পাইলাম ;—

প্রিয় যোগেনবাবু

আমার শত শত প্রণাম গ্রহণ করিবেন ও শ্রীযুক্তা বধূঠাকুরাণীকে জানাইবেন।

পরে সংবাদ এই যে আপনি বাড়ী হইতে যাওয়ার পরই জমিদারের পক্ষ হইতে গ্রামের প্রজাদের উপর ঘোর অত্যাচার উৎপীড়ন আরম্ভ হইয়াছে। জমিদার পুত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে প্রত্যেক প্রজার নিকট হইতেই খাজনার প্রতি টাকায় চারি আনা হারে ভিক্ষা আদায়ের ব্যবস্থা হইয়াছে। ধনী দরিদ্র কেহই এই ভিক্ষার দায় হইতে অব্যাহতি পাইতেছে না ; গতকল্য দরবেশ মোল্লা এই ভিক্ষা দিতে না পারায় নায়েব কালিপদ বিশ্বাস স্বহস্তে তাহাকে জুতাপেটা করিয়াছে। তাহা ছাড়া আরও নানা রকমের অত্যাচার হইতেছে। পুণ্যাহের

দিন জমিদার বাড়ীতে দুধ দিতে অস্বীকার করায় শ্যামাচরণ কর্ম্মকারকে গত রবিবারে সদরে ডাকিয়া লইয়া যায়। সেখানে দেওয়ানবাবু স্বয়ং তাহাকে নানারকম অপমান করিয়া এবং পরিশেষে পঁচিশ টাকা জরিমানা আদায় করিয়া লইয়া তবে ছাড়িয়া দিয়াছেন। ইহা ছাড়া তিনি আরও অনেককে শাসাইয়া দিয়াছেন। বলিয়াছেন যে গ্রামের যেসব প্রজা জমিদারের অবাধ্য হইবে, তাহাদের বাকি খাজনার দায়ে ফেলিয়া জমি জমা সমস্ত নিলাম করিয়া গ্রাম হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইবে। এখন উপায় কি? আপনারই সাহসে আমরা গ্রামে বাস করি; আপনি চলিয়া যাওয়ায় আমাদের গ্রাম ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যাওয়া ছাড়া উপায় নাই। এদিকে জমিদারের এই উৎপীড়ন, অন্যদিকে গ্রামে ও পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে কলেরার ভীষণ প্রকোপ চলিতেছে। এক মাসের মধ্যে পাঁচটি গ্রামে মোট ২৩১ জন মরিয়াছে। এ দিকে পুকুর পুষ্করিণী মজিয়া গিয়াছে; পার্শ্ববর্ত্তী নদীর জল সুপেয় না হইলেও তাহাই পান করিয়া লোকে কোন রকমে জীবনধারণ করে। কিন্তু সেই নদীর জলে যখন তখন কলেরার মড়া ফেলিয়া দেওয়া হইতেছে; আর কলেরার মলমূত্র ইত্যাদি যে কত ফেলা হইতেছে, তাহার ত ইয়ত্তাই নাই। এখন আমাদিগকে কি করিতে বলেন? বাপ দাদার ভিটাখানা আগুলিয়া মরণের কোলে

ঝাঁপই দিব, না গ্রাম হইতে পলাইয়া গিয়া কোন রকমে প্রাণ-রক্ষা করিব ? আশা করি শীঘ্র পত্রোত্তর দিয়া সুখী করিবেন।

শ্রীচরণে নিবেদন ইতি।

সেবক শ্রী যজ্ঞেশ্বর সরকার।

যজ্ঞেশ্বরের পত্রের উত্তরে আমি তাহাকে লিখিলাম ;—

"পরম কল্যাণবরেষু।

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত কথা অবগত হইলাম। আমি এখানে আসার পর হইতে জমিদারের অত্যাচার খুব বাড়িয়া গিয়াছে লিখিয়াছ। তাহারা যত পারে অত্যাচার করিয়া লউক ; অন্য কোন প্রকার ঘুস ভিক্ষা বা তোমরা কিছুতেই দিও না ; না হয় দেওয়ানজী জমিজমা নিলাম করিয়াই লইবেন। কিন্তু ভগবানের রাজ্যে অন্যায় বা জোর-জুলুম বেশীদিন চলে না ; পরিণামে অত্যাচারীর মাথার মুকুট খসিয়া পড়েই। তোমরা ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাক।

গ্রামে ও পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে কলেরা হইতেছে লিখিয়াছ। এক দিকে ম্যালেরিয়া আর কালাজ্বর, অন্যদিকে কলেরা। লোকের সহেই বা কত ? যাহা হউক, আমি গ্রামে চিকিৎসক ও সেবক পাঠাইবার জন্য কংগ্রেস-কমিটী ও রামকৃষ্ণ মিশনের নিকট টেলিগ্রাম করিলাম। এ সময়ে আমি নিজে থাকিতে পারিলে

ভাল হইত ; কিন্তু কি করিব, আমি এখানে ছয় মাসের ঠিকায় বাড়ী ভাড়া করিয়াছি। ইহার মধ্যে মাত্র এক মাস অতীত হইয়াছে। এখন যদি দেশে ফিরি তবে আমাকে পাঁচমাসের ভাড়া পাঁচ শত টাকা দণ্ড দিতে হইবে। বিশেষ শোকের আঘাতে আমি এখনও খুবই অবসন্ন, দিন কয়েক বাহিরে না থাকিলে আমি এ আঘাত সাম্‌লাইতে পারিব না। তোমরা ব্যাকুল হইও না, গ্রামত্যাগ করিয়াও পলাইও না। পাঁচটি মাস কোন রকমে তোমরা অপেক্ষা কর—তারপর আমি দেশে ফিরিলে, আমার উপর সকল বোঝা দিয়া তোমরা নিশ্চিন্ত হইও।

তবে আপাততঃ জীবনরক্ষার জন্য সকলকেই একটু সচেষ্ট হইতে হইবে। জানি জমিদারের দোষেই গ্রামের এই দুরবস্থা হইয়াছে। তাহারা যদি নিজেদের কর্ত্তব্য ঠিক ঠিক পালন করিত তাহা হইলে এ ভাবে আমাদের গ্রামখানি ধ্বংস হইয়া যাইত না। ম্যালেরিয়াই বল, কালাজ্বরই বল, আর কলেরাই বল, সকলেরই মূল কারণ দূষিত জল পান। গ্রামে বিশুদ্ধ জল একেবারেই নাই ; জমিদার এ যাবৎ কেবল খাজানা আদায়ই করিয়াছে, প্রজা মরিল কি বাঁচিল তাহা দেখে নাই, দেখিবার চেষ্টাও করে নাই। কিন্তু তাই বলিয়া আমাদেরও কি কোন কর্ত্তব্য নাই ? নদীর জল পান আপাততঃ সকলেই বন্ধ কর। আর পানীয় জলের জন্য গ্রামে

কতকগুলি কূয়া নিজেরাই খুঁড়িয়া ফেল। এখন কোন রকমে জীবনরক্ষা হউক, পরে স্থায়ী ব্যবস্থাও করা যাইবে।

তবে জমীদারের ব্যবহারে আক্ষেপ হয় বৈ কি। হায়! ইহারা যদি মানুষ হইত তবে কি এমন করিয়া আজ আমরা তিলে তিলে মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হইতাম? এই দারুণ নিদাঘে প্রজাগণ একবিন্দু জলের অভাবে শুষ্ককণ্ঠে ছটফট করিতেছে, মহামারীতে কুক্কুর বিড়ালের মত ধ্বংসমুখে পতিত হইতেছে, আর সেই সময়ে জমিদার বাবু প্রজার বুকের রক্তদ্বারা ষ্টিমলঞ্চ কিনিয়া পদ্মাবক্ষে জলবিহার করিতেছেন, এ দৃশ্য দেখিলে যে চোক ফাটিয়া রক্ত বাহির হয়। শুনিতে পাই, জমিদারের না কি টাকা নাই; তা থাকিবেই বা কেন? প্রজার উপকারের বেলায় তাঁহার তহবিল শূন্য হয় বৈকি। তবে নগরবিলাসের সময় তাঁহার অর্থরাশি কুবেরের ধনভাণ্ডারের ন্যায় অক্ষয় ও অনন্ত হইয়া উঠে। এ দিকে প্রজার এই দুরাবস্থা, অন্যদিকে জমিদার বাবুর দানশীলতা দেখিয়া সংবাদপত্রে তুমুল ঢাকের বাদ্য উত্থিত হইয়াছে;—"দমদমার মহারাজ বাহাদুর অন্তগামী ছোটলাট সার পিশাচবেরীর মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য একলক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।" এই ঢাকের বাদ্যে আমাদের কাণ বধির হইবার উপক্রম হইল। ইহা ছাড়া বিলাসিতা আছে;—পঁচিশখানা

মোটরকার, ষোলখানা জুড়ি গাড়ি, পঁচিশখানা ষ্টীমলঞ্চ ইত্যাদি। যাহা হউক, হতাশ হইবার কারণ নাই। আমি বেশী দিন এখানে থাকিব না, যত শীঘ্র পারি ফিরিয়া তোমাদের সুখ দুঃখের অংশভাগী হইব। ইতি

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হরিদ্বারে আসিবার পর তিন মাস কাটিয়া গেল। আমি এখানে আসিয়া বেশ একটু শান্তি পাইয়াছি; কিন্তু কমলার মনের অবস্থা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত; প্রায়ই সে কান্নাকাটি করে, এবং বলে যে অমিয়কে একা ফেলিয়া এখানে সে থাকিতে পারিবে না। অনেক প্রবোধ দিয়া তবে তাহাকে রাখিয়াছি।

নিত্যকার মত আজও বৈকালে বেড়াইতে বেড়াইতে হরকি পায়রী ঘাটের উপর আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানে অগণ্য ধর্ম্মপ্রাণ নরনারীর ভক্তির হাট লাগিয়া গিয়াছে। নীচে পতিতপাবনী গঙ্গা কি মধুর কল্লোল সহ সমুদ্রের দিকে চলিয়াছে। গঙ্গার জল শুভ্র স্ফটিকের মত স্বচ্ছ। কি প্রখর তাহার স্রোতবেগ। সকলেই মুগ্ধচিত্তে জাহ্নবীর দিকে চাহিয়া আছে। আমি নিত্য-

কার অভ্যাসমত গঙ্গায় নামিয়া অঞ্জলি পূরিয়া জলপান করিতেছি আর কমলা একটু দূরে দাঁড়াইয়া তন্ময়ভাবে গঙ্গার শোভা নিরীক্ষণ করিতেছে। সহসা তাহার আহ্বান আমার কানে গেল,—"ওগো দেখ দেখি ঐ যে—ঐ।" আমি তাড়াতাড়ি জলপান শেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কি হইয়াছে? ডাকিলে কেন?" সে আবার বলিল—"ঐ যে ঐ চলে গেল, তুমি দেখ্‌তে পেলে না?" আমি বলিলাম,—"কি চলে গেল?" কমলা এবার শুধু বলিল,—"আমার মন কেমন করিতেছে, শীঘ্র বাসায় চল।" আর বিলম্ব করিলাম না, তখনই বাসায় রওনা হইলাম, কিন্তু দেখিলাম যে সে হাঁটিতে পারিতেছে না, সুতরাং একখানা টাঙ্গা ভাড়া করিয়া তাহাকে লইয়া তাহারই উপর উঠিয়া বসিলাম।

বাসায় ফিরিয়াই কমলা বিছানায় শুইয়া পড়িল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কি কমল, অমন করিতেছ কেন?" সে বলিল,—"তুমি যখন জলপান করিতেছিলে, তখন ঘাটের উপর আমার অমিয়ের মত একটী ছোট্ট ছেলেকে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিলাম। ঠিক তেমনি মুখ, তেমনি চোখ, তেমনি নাক, তেমনি গড়ন—একেবারে হুবহু মিল; কিন্তু তোমাকে ডাকিতেই সে ভিড়ের মধ্যে কোথায় মিলাইয়া গেল। তাহাকে দেখিয়া অবধি আমার

মনের মধ্যে কেমন হু-হু করিতেছে। আমি এখানে থাকিয়া অমিয়ের কথা অনেকটা ভুলিয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু এই ছেলেটী পলকের জন্য দেখা দিয়া আমার বুকে নূতন শেল হানিয়া গেল। এখন কেবলই অমিয়ের কথা মনে হইতেছে; তাহাকে একা ফেলিয়া আসিয়া আমি কি করিয়া এখানে থাকিব বল দেখি? আমাকে আজই তাহার কাছে লইয়া চল।" দেখিলাম, আজ আর যুক্তিতর্কের অবতারণা করা বৃথা। সুতরাং তাহাকে বলিলাম,—"অমিয় বেশ সুখেই ঘুমাইতেছে, তুমি যাইয়া অনর্থক তাহার ঘুম ভাঙ্গাইয়া বৃথা কেন তাহাকে কষ্ট দিবে? তার বদলে আমার একটু ভাল করিয়া সেবা শুশ্রূষা কর। দেখিতেছ না, দিনরাত্রি ভাবিয়া ভাবিয়া আমি কেমন হইয়া গিয়াছি? শুধু হাড় ক'খানাই আছে, চিন্তায় চিন্তায় শরীরের আর কি আছে? দেখ দেখি একবার আমার চেহারাখানা।" এই বলিয়া শরীর হইতে জামা-কাপড় সব খুলিয়া ফেলিলাম। কমলা আমার শরীরের দিকে তাকাইয়া শিহরিয়া উঠিল, বলিল—"তুমি এমন হইয়া গিয়াছ, তাহা আমি একদিনও বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু এখন হইতে আমি সাবধান হইলাম। তোমার শরীর যাতে ভাল হয়, আগে তাই কর। কাল একবার রামকৃষ্ণ মিশনের ডাক্তারকে আনিয়া ভাল করিয়া শরীরটা দেখাও

দেখি।” * * * * * বলা বাহুল্য, এই কৌশলে আমি কমলার মনের গতির পরিবর্ত্তন করিয়া দিলাম।

পরদিন দুপুরবেলা আহারের পর তাহাকে চৈতন্যচরিতামৃত পড়িয়া শুনাইতেছি, এমন সময়ে পোষ্টম্যান আসিয়া একখানি চিঠি দিয়া চলিয়া গেল। কমলা তখনই চিঠিখানা খুলিয়া ফেলিয়া বড় বড় করিয়া পড়িতে লাগিল :—

শ্রীচরণ কমলেষু।

আপনাকে কতবার যে পত্র লিখিলাম, তাহার সংখ্যা নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, একক একখানিরও উত্তর পাইলাম না। আমাদের কথা কি আপনার একবারও মনে হয় না? শুনিতে পাই, আপনি নাকি মন ভাল করিবার জন্য প্রবাসে গিয়াছেন। আমি কিন্তু তাহা মোটেই বিশ্বাস করি না, বরং আমার ধারণা এই যে, আপনি রোগ-ব্যাধির ভয়ে দেশ ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু এটা কি আপনার পক্ষে ভাল কাজ হইয়াছে? আপনার কিছু সঙ্গতি আছে, আপনি না হয় পলাইয়া ব্যাধির-হাত এড়াইলেন; কিন্তু গরীব দুঃখীরা কি করিবে? তাহারা কোথায় পলাইয়া যাইবে? আপনি হয়ত বলিবেন, ম্যালেরিয়া কালাজ্বরে প্রাণ দেওয়া অপেক্ষা বিদেশে পলাইয়া প্রাণরক্ষা করাই সঙ্গত। জিজ্ঞাসা করি, দেশের দুঃখ দৈন্যের প্রতী-

কার না করিয়া—ভাই বন্ধুসকলকে বিপদের মাঝে রাখিয়া, শুধু নিজের প্রাণটা বাঁচান কি খুবই পৌরুষের কার্য্য ?

উপরে যাহা লিখিলাম, তাহাতে যদি কোন অপরাধ হইয়া থাকে তবে মার্জ্জনা করিবেন, এবং আপনি ও কাকিমা আমাদের শত শত প্রণাম গ্রহণ করিবেন। শ্রীশ্রীচরণে নিবেদন ইতি।

সেবক দিগিন্দ্র।

দিগিন্দ্র আমার ভাইঝী-জামাই, আমার বড় আদরের শৈলবালার স্বামী। তাহার চিঠি পড়িয়া কমলা বলিল,—"তুমি যে চিঠি লেখার পাঠ একেবারে তুলিয়াই দিলে, বোধহয় আজকাল এমনি করিয়াই খাম পোষ্টকার্ডের খরচ বাঁচাইয়া কিছু সঞ্চয়ের দিকে মন দিয়াছ। কিন্তু ভদ্রতাও কি নাই? একটা লোক কম করিয়া হইলেও ৫।৭ খানা চিঠি লিখিল, অথচ তুমি একেবারে নিরব। দুনিয়ায় থাকিতে গেলে অত মায়াবাদী হইলে চলে না।" আমি হাসিয়া বলিলাম, "আর লজ্জা দিও না কমল"। দোষ আমার হইয়াছে স্বীকার করিতেছি। যাহা হউক, দোয়াত কলমটা আনিয়া দাও, এখনই এর জবাব লিখিয়া দিতেছি।' কমলা দোয়াত-কলম এবং চিঠির-কাগজ আনিয়া দিল। আমি দিগিন্দ্রকে লিখিলাম :—

## পূজার অর্ঘ্য

পরম কল্যাণবরেষু।

আশীর্ব্বাদ জানিবে। তুমি আমাকে যতগুলি পত্র লিখিয়াছ সমস্তই আমি পাইয়াছি। মানসিক অশান্তিবশতঃ সে সবের উত্তর দিতে পারি নাই। বিশেষ তোমার কাকীমা বরাবরই শৈলবালকে চিঠিপত্র লিখিতেছেন; সেইজন্য তোমাকে পৃথক করিয়া পত্র লিখা তত্তটা আবশ্যক বোধও করি নাই। যাহা হউক, আজ মনটা কিছু ভাল আছে, সেইজন্য তোমাকে পত্র লিখিতে বসিয়াছি।

গত পরশু প্রাতে তোমার কাকীমাকে সঙ্গে লইয়া পাহাড়ের উপর চণ্ডীমাতাকে দর্শন করিতে গিয়াছিলাম, তাহাতেই মনে বড় শান্তি পাইয়াছি। ফিরিবার সময় হিমালয়ের অতুলনীয় শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। এই স্বভাবসুন্দর পার্ব্বত্য-প্রদেশে প্রকৃতি-দেবী যাহা-কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার সমস্তই বুঝি মনোরম। ফিরিতে ফিরিতে আমার এই নিতান্ত নীরস মনেও কবিত্বের উদয় হইয়াছিল। দেখিলাম পর্ব্বতের পাদদেশে একটি অনিন্দসুন্দরী পার্ব্বত্য বালিকা রূপের প্রভায় চারিদিক আলো করিয়া মেষপাল চরাইতেছে। নিদাঘের প্রখর রবিকরে তাপিতা হইয়া বালিকা একটি বৃক্ষের ছায়াতলে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে, এবং বামকরে তাহার সুন্দর কপোল বিন্যস্ত করিয়া গাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছে।

ছোট ছোট মেষ শাবকগুলি বালিকার চতুর্দ্দিকে আসিয়া শয়ন করিয়াছে, যেন তাহারাও বালিকার চিন্তায় চিন্তিত হইয়া রোমন্থন হইতে বিরত রহিয়াছে। আমি নিপুণ চিত্রকর নহি, নতুবা এই সুন্দর দৃশ্য আমি চিত্রপটে অঙ্কিত করিয়া রাখিতাম।

বাজে কথা লইয়া অনেকদূর আসিয়া পড়িয়াছি। মানসিক শান্তির কথা বলিতে গিয়াই এই সব লিখিতে হইল। যাহা হউক তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ যে, গ্রামের স্বাস্থ্য যাহাতে ভাল হয় তাহার চেষ্টা না করিয়া হঠাৎ এরূপ ভাবে দেশত্যাগ করা আমার পক্ষে উচিৎ হইয়াছে কি না। উচিৎ যে হয় নাই, তাহা অস্বীকার করিব না, কিন্তু ইহাও ধ্রুব সত্য যে একা একজনের চেষ্টায় কোন পল্লার স্বাস্থ্য উন্নত হওয়া সম্ভব নয়। আমি অনেকবার আমাদের গ্রামের নেতাদের চৈতন্য উৎপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছি, বলা বাহুল্য যে কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। তাঁহারা দলাদলি ও মামলা মোকদ্দমা লইয়া এতই বিব্রত যে এসকল বিষয়ে দৃষ্টি করা আবশ্যক বোধ করেন না।

জিজ্ঞাসা করিতে পার, তবে কি পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্য উন্নত হইবার কোন আশাই নাই? আশা যে নাই এমন কথা বলিতে পারি না; কিন্তু শ্মশানে শব-সাধনার ন্যায় সেজন্য কঠোর তপস্যার প্রয়োজন। মোটের উপর ইহা বলা যাইতে পারে যে, আমাদের

দেশের জমিদারগণ যদি নগর বিলাস ছাড়িয়া প্রজাবর্গের হিতে অবহিত হয়েন, এবং গ্রামের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যদি সহরে বাড়ী করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারেন, তবে এই সমস্যার সমাধান হইতে বেশী বিলম্ব হইবে না। এই যে ঝুড়ি ঝুড়ি উকীল মোক্তার ব্যারিষ্টার প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায় ইঁহাদের কয়জন জন্মভূমিতে পদার্পণ করেন? পূর্ব্বে ইঁহারা সুদীর্ঘ পূজার ছুটিতে দেশে ফিরিয়া পুরাতন চণ্ডীমণ্ডপ মেরামত করাইয়া মায়ের পূজা করিতেন এবং অন্ততঃ সামান্য কয়েকটি দিনের জন্যও পল্লীতে আনন্দের উৎস বহাইতেন। কিন্তু আজকালকার হাল ফ্যাশানে ইঁহারা হাওয়া খাওয়াই এই সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত করেন। ছুটি হইবার সঙ্গে সঙ্গে কেহ বা ওয়ালটেয়ারে ছুটিলেন কেহ বা কাশীতে, কেহ কেহ দেরাদুনে কেহ বা পুরীতে। এমনি করিয়া ইঁহারা পল্লীর চাষা প্রতিবাসীদিগের সহিত মিশিবার শঙ্কট পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে হাওয়া খাওয়া ফিরিয়া আসেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় নহে কি? যাঁহারা আমাদের দেশের জমিদারগণকে স্বর্ণ-গর্দ্দভের সহিত তুলনা করেন, তাঁহারা যে বড় অন্যায় করেন না তাহা অস্বীকার করিব না। কিন্তু এই সকল হাওয়াসেবীকে কোন্ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা উচিত? যাহা হউক, সামান্য

কিছু দিনের জন্যও মায়ের কোল ছাড়িয়া আসিয়া যে মহাভুল করিয়াছি, অবিলম্বে রতন পুরে ফিরিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিব।

ইতি।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তীর্থ বাস শেষ করিয়া কয়দিন হইল দেশে ফিরিয়াছি। কমলা এখন শিশু মাত্রকেই আদর করে—যাহাকে পায় তাহাকেই নিজের অগাধ মাতৃস্নেহ ঢালিয়া দেয়, স্তন্যপায়ী শিশুকে একবার নিজের স্তনপান না করাইয়া কিছুতেই ছাড়িয়া দেয় না। বোধহয় এখন প্রত্যেক শিশুর মধ্যেই সে অমিয়কুমারকে দেখিতে পায়, তাই নিঃসঙ্কোচে হৃদয়ের সবখানি স্নেহ মমতা দিয়া তাহাকে আদর করে। এমনি করিয়া সে অমিয়কুমারের শোক অনেকটা ভুলিয়াই গিয়াছে। একদিন কথা প্রসঙ্গে সে আমাকে বলিল, "দেখ দেখি এখানে থাকিয়া কত আনন্দ: এখানকার প্রত্যেক শিশুর মধ্যেই আমি অমিয়কে প্রত্যক্ষ করি। শুধু কি তাই? এখানকার আকাশে বাতাসেও যেন আমি তাহাকে দিব্যভাবে দেখিতে পাই। বুঝিতে পার না এস্থানের বাতাস কেমন মধুগন্ধবাহী, তাহার

স্পর্শ কত সুখকর? তুমি কিনা এমন স্বর্গ ছাড়িয়া হরিদ্বারে শান্তি খুঁজিতে গিয়াছিলে, তোমার সাত পুরুষ যেখানকার মাটিতে মিশিয়া গিয়াছেন, তাহার অপেক্ষা পবিত্র তীর্থ কি আর দুনিয়াতে আছে?" আমি কমলাকে বাধা দিয়া কহিলাম,—"এসকল স্থান এককালে স্বর্গই ছিল কমল,—কিন্তু এখন এগুলি নরকের চাইতেও অধম হইয়াছে। ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, কলেরা, বসন্ত সাক্ষাৎ যমের মত কত লোককে যে লইয়া যাইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এর উপর অজ্ঞতা, দারিদ্র্য এবং জমিদারের অত্যাচার গ্রামের লোককে একেবারে পিশিয়া ফেলিতেছে। যাহা হউক এবার মৃত্যু পণ করিয়াই আমি কার্য্যে অগ্রসর হইব। জানি আমি একাকী, আমার শক্তি অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু তবু এই ক্ষুদ্র শক্তি লইয়াই প্রাণপাৎ করিব। আর কিছু না পারি, পল্লীর দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া জ্বালাময়ী ভাষায় গ্রামের দুঃখ দুর্দ্দশার কথা বর্ণনা করিয়া গ্রামবাসীর কর্ম্মশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিব। তাহাদের কর্ম্মশক্তি উদ্বুদ্ধ হইলে কোন কার্য্যই বাকী থাকিবে না। দেশে অর্থের যে খুবই অভাব, একথা বিশ্বাস করিতে পারি না। অভাব কেবল শক্তির, অভাব কেবল প্রবৃত্তির। সুতরাং এবার সর্ব্বপ্রথমে দেশের কর্ম্ম শক্তিকেই উদ্বুদ্ধ করিব। প্রত্যেক মানবের মধ্যে যে মহাশক্তি প্রচ্ছন্ন

আছে, তাহাকে জাগ্রত করিতে পারিলে অসাধ্য সাধন করিতে পারিব। অতীতের নির্ম্মম স্মৃতিকে মানসপট হইতে সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া ফেলিয়া নবীন আশায় ও নবীন উদ্যমে কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইব। যে-আগুন আমার প্রাণের মধ্যে জ্বলিতেছে, আমার দেশবাসীর মধ্যেও সেই আগুন জ্বালাইব সকলকে প্রাণপণে বুঝাইব যে, আমরা ক্ষুদ্র নই, শক্তিহীন নই, কাপুরুষ নই; আমরা অতি উচ্চ, অতি উদার, অতি শক্তিশালী, অতি মহৎ; সুতরাং সিদ্ধিলাভ যে সুনিশ্চিত তাহাতে সন্দেহ নাই।" কমলা খুসি হইয়া বলিল,—"বেশ, তাই কর; যাতে আর কাহারও কোলের বাছা এমন করিয়া বুক খালি করিয়া না যায়।"

# পূজার অর্ঘ্য

## মানসী

### প্রথম পরিচ্ছেদ

পাবনার একটী সুদূর গ্রামে নিভৃত পল্লীতে আমাদের ছোট্ট বাড়ীখানি অবস্থিত হইলেও রাজসাহীতেই আমার শৈশব ও বাল্যকাল অতিবাহিত হইয়াছিল। পিতৃদেব তখন রাজসাহীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উকীল, তাঁহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তির সীমা ছিল না।

পাঠশালার শিক্ষা সমাপ্ত হইলেই তিনি আমাকে রাজসাহীর কলেজিয়েট্ স্কুলে প্রবিষ্ট করাইয়া দেন। কলেজিয়েটে পাঠকালে একটী মহৎ হৃদয় বালকের সহিত আমার আন্তরিক সৌহার্দ্দ্য জন্মিয়াছিল। এই বালকের নাম যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

যোগেশের পিতা মতিলালবাবু রাজসাহীতে মোক্তারি করিতে করিতে তাঁহার মাথার চুল পাকাইয়া ফেলিয়াছিলেন। আমি যোগেশের সহিত বন্ধুত্ব বশতঃ মধ্যে মধ্যে তাহাদের পদ্মাতীরবর্ত্তী বাসা-বাটীতে যাইতাম।

সেই কৈশোরে আমি যোগেশের সহিত বসিয়া পদ্মার শোভা

দেখিতে বড়ই ভালবাসিতাম। নিত্য সন্ধ্যায় তাহার সহিত মিলিত হইয়া পদ্মার সায়ংকালীন্ অতুলনীয় দৃশ্য দর্শন করা আমার দৈনন্দিন কর্ত্তব্যের মধ্যে ছিল।

বর্ষাকাল, নদীর জল কূলে কূলে ভরা। স্ফীতযৌবনা পদ্মা তরঙ্গের উপর তরঙ্গ তুলিয়া উভয় কূল প্রতিধ্বনিত করিয়া সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হইতেছে। দূরে অনতিদূরে পদ্মার সীমার পারে সূর্য্যদেব পশ্চিমগগনে ঢলিয়া পড়িয়াছেন—অস্তগামী সূর্য্যের স্বর্ণবর্ণ কিরণ সকল পদ্মার তরঙ্গরাজির উপরে নাচিয়া নাচিয়া খেলা করিতেছে। ক্রমে তপনদেব অস্তগমনোন্মুখ হইলেন—পশ্চিমগগন রঞ্জিত করিয়া একখানি স্বর্ণ গোলকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তারপর দেখিতে দেখিতে সেই স্বর্ণ গোলকখানি ঝুপ্ করিয়া পদ্মার নীরে ডুবিয়া গেল। যোগেশ ও আমি পদ্মাতটে বসিয়া আলোকোজ্জ্বল দিগন্তবিস্তৃত নীলিমা রাজির অন্তরালে সূর্য্যদেবের এই অস্ত গমন শোভা দেখিতেছিলাম; এমন সময়ে একটী বালিকা পশ্চাদ্দিক হইতে আসিয়া তাহার ছোট্ট হাত দুইখানি দ্বারা আমার নয়নদ্বয় আবৃত করিয়া বলিল,—"বল দেখি আমি কে?"

আমি। তুমি? তুমি মলিনা।

বালিকা। না।

আমি। তবে এইবার ঠিক বলিব ?

বালিকা। হাঁ।

আমি। তুমি ? তুমি মানসী।

'এইবার ঠিক বলেছ' বলিয়া হাসিতে হাসিতে বালিকা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। আমি বলিলাম,—"মানসী! তুমি কাকে বেশী ভালবাস ? আমাকে, কি তোমার দাদাকে।" বালিকা হাসিয়া বলিল, "তোমাদের দুজনকেই সমান ভালবাসি।"

মানসী যোগেশের কনিষ্ঠা ভগ্নী, এই সবে সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। যোগেশ ও আমি যখন নিত্য সায়ংকালে পদ্মাতীরে আসিয়া বসিতাম, মানসী আমাদের সঙ্গে আসিয়া পদ্মার সায়ংকালীন্ শোভা দেখিতে বড় ভালবাসিত।

যথাসময়ে যোগেশ ও আমি একই সঙ্গে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইলাম। উত্তীর্ণ হইয়া পরে উভয়েই রাজসাহী কলেজে এফ-এ পড়িতে লাগিলাম। এই সময় আমাদের উভয়েরই বয়স ষোল বৎসর।

যোগেশের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব বন্ধন একদিনের জন্যও শিথিল হয় নাই। বয়সের বৃদ্ধির সঙ্গে আমরা উভয়ে উভয়ের গুণে পরস্পরের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইতেছিলাম। একবার আমার জ্বর হইয়াছিল। সপ্তাহকাল জ্বরে শয্যাগত ছিলাম।

যোগেশ এই সপ্তাহকাল এক মুহূর্ত্তের জন্যও বাড়ী যায় নাই ; নিয়ত আমার শয্যাপ্রান্তে বসিয়া থাকিত—আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা আমার পরিচর্য্যা-কার্য্যে লাগিয়া থাকিত। আমি তাহাকে বাড়ী যাইবার জন্য সহস্র অনুরোধ করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিতাম না। যোগেশের ন্যায় দ্বিতীয় বন্ধু এজীবনে আর পাইব না। পরজীবনে পাইব কি না কে জানে ?

আর বালিকা মানসী অজ্ঞাতসারে আমার হৃদয়খানি অধিকার করিয়া লইতেছিল। অন্যে ইহা লক্ষ্য করিয়াছিল কি না জানি না, কিন্তু যোগেশ আমার হৃদয়ের ভাব বেশ ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিল। একদিন বেড়াইতে গিয়া সে আমাকে নির্জ্জনে পাইয়া বলিল,—"দেখ মণি! তুমিই মানসীর উপযুক্ত পাত্র। আমার যদি হাত থাকে ; তবে তোমারই হাতে আমি মানসীকে অর্পণ করব।"

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যথাসময়ে যোগেশ ও আমি রাজসাহী হইতে এফ্-এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম। এফ্-এ., পাশ করিবার পর যোগেশ শিবপুরের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়িতে গেল, আমি রাজসাহীতেই বি-এ, পড়িতে লাগিলাম।

যোগেশের বিরহ আমি বড় তীব্রভাবে অনুভব করিতে লাগিলাম। দুইটী বৎসর কোন রূপে কাটাইয়া দিলাম। তারপর যথাসময়ে বি-এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এম্-এ পড়িবার জন্য কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হইলাম। অবশ্য পিতৃদেবের ইচ্ছা ছিল যে, আমি আর এম্ এ, পড়িতে না যাইয়া একেবারে ল ক্লাশে ভর্ত্তি হই। কিন্তু আমি তাঁহাকে স্পষ্ট জবাব দিয়া দিলাম যে, নিত্য চোগা-চাপ্‌কান পরিয়া, শাম্‌লা মাথায় দিয়া কাছারী-বাটীতে হাজিরা দেওয়া আমার দ্বারা কিছুতেই হইবে না। ফলে তিনি আর এজন্য বেশী পীড়াপীড়ি করিলেন না। তবে আমার রাজসাহী ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই তিনিও উকীলি ব্যবসায় ছাড়িয়া দিলেন এবং জীবনের শেষ কয়টী দিন নিভৃতে ঈশ্বরচিন্তায় অতিবাহিত কবিবার জন্য পাব্‌নার পল্লীভবনে যাইয়া আশ্রয় লইলেন

কলিকাতায় যাইয়া যোগেশকে পাইয়া আবার আমি পূর্ব্বের ন্যায় সুখী হইলাম। দুই বৎসরের দীর্ঘ বিরহের পর মিলন হওয়ায় এবার আমাদের বন্ধুত্ব-বন্ধন পূর্ব্বের অপেক্ষাও সুদৃঢ় হইয়া উঠিল।

যথাসময়ে আমি এম্-এ পরীক্ষায় পাশ করিলাম, এবং ইহার কিছুদিন পরেই গবর্ণমেণ্ট আমাকে আড়াই শত টাকা বেতনে ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়া পাটনা কলেজে পাঠাইয়া দিলেন। যোগেশও এই সময়ে শিবপুর কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। তাহার ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করিবার পরই রাজ-সাহীর জেলা বোর্ডে ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ারের পদ খালি হইল, এবং যোগেশ আবেদন করিবা মাত্র সেই পদে নিযুক্ত হইল।

পাটনায় আসিয়া আবার আমি যোগেশের বিরহে বড় কাতর হইয়া পড়িলাম। ইহার মধ্যে একদিন তাহার নিকট হইতে এক পত্র পাইলাম। যোগেশ লিখিয়াছে,—"এখানকার কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক সন্তোষবাবু এক বৎসরের ছুটি লইতেছেন। তুমি সেক্রেটারী বেল্ সাহেবের সহিত দেখা করিয়া রাজসাহী কলেজে বদলী করাইয়া লইবে।" তাহার পর একদিন দার্জ্জিলিংএ যাইয়া সেক্রেটারী সাহেবের সহিত দেখা করিলাম; তিনিও আমার অনুরোধ রক্ষা করিতে স্বীকৃত হইলেন।

পর সপ্তাহের 'কলিকাতা গেজেট' খুলিবা মাত্রই দেখিলাম যে, রাজসাহী কলেজে আমার বদলী হইয়া গিয়াছে। বড় আহ্লাদ হইল। যোগেশের সহিত মিলিত হইবার আশায় আবার আমি উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম।

নির্দ্দিষ্ট দিনে আমি রাশিকৃত লগেজ সঙ্গে লইয়া রাজসাহীতে যাইয়া নামিলাম। ষ্টীমার-ঘাটেই যোগেশ আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল। সে ভৃত্যকে আমার লগেজের ভার দিয়া স্বয়ং আমাকে তাহারই মোটরে করিয়া তাহার বাসায় লইয়া গিয়া উপস্থিত করিল। পূর্ব্ব হইতেই আমার জন্য বাড়ী ভাড়া করিয়া রাখা হইয়াছিল; কিন্তু সেদিন আর যোগেশ আমায় বাসায় যাইতে দিল না।

যোগেশের মাকে প্রণাম করিবার জন্য আমি তাহার সঙ্গে বাটির মধ্যে গেলাম। সহসা পশ্চাদ্দিক হইতে কে ডাকিল—"মণিদা!' ফিরিতেই দেখিতে পাইলাম, মানসী দাঁড়াইয়া আছে। এই দুই বৎসরে তাহার কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মানসীর এখন আধফুটন্ত যৌবন—আপনার রূপে সে আপনি আলোকিত। বলা বাহুল্য, আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম—চাহিয়া চাহিয়া তাহার অতুলনীয় রূপরাশি দেখিতে লাগিলাম। সহসা গৃহিণীর আহ্বান কর্ণে গেল,—"মণি!

এসেছিস্ ?" আমি অপ্রতিভ হইয়া ঢিপ্ করিয়া তাঁহাকে একটী প্রণাম করিলাম।

*    *    *    *    *

পরদিন অতি প্রত্যূষে উঠিয়া বাসায় যাইবার জন্য আমি গৃহিণীর নিকট বিদায় লইতে গেলাম। ফিরিবার সময় দেখিলাম বহির্ব্বাটীতে আসিবার রাস্তার ধারে গৃহের অন্তরালে মানসী একাকিনী দাঁড়াইয়া আছে। আমি নিকটে আসিলে সে আমাকে ডাকিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিল,—"মণিদা, একটা কথা শুনে যাও।" আমি কাছে যাইয়া বলিলাম,—"কি মানসী"। মানসী অধোবদনে হাতের নখ খুঁটিতে খুঁটিতে বলিল,"তুমি কি মাঝে মাঝে আমাদের বাটীতে আসিবে মণিদা", আমি তাহার হাত ধরিয়া বলিলাম,—"আসিব বৈকি ; তোমায় কি আমি ভুলিয়া থাকিতে পারিব মানসী ? তাও কি সম্ভব।" মানসী কম্পিত কণ্ঠে কহিল, "তোমাদের কাজ-কর্ম্মের খুব ঝঞ্ঝাট কি না ; তাই বলিতেছি, কোন রকমে সময় করিয়া লইয়া মার সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা করিয়া যাইও।" এই বলিয়া সে আমার হাতের মধ্য হইতে তাহার কোমল করপল্লবখানি বাহির করিয়া লইয়া দ্রুতবেগে বাটীর মধ্যে চলিয়া গেল। আমি সব ভুলিয়া গিয়া মুগ্ধনেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। শেষে যখন আর তাহাকে দেখা গেল না, তখন ধীরে ধীরে বহির্ব্বাটীতে চলিয়া আসিলাম।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

একদিন আমি সবেমাত্র কলেজ হইতে বাসায় ফিরিতেছি এমন সময়ে যোগেশের প্রিয়ভৃত্য হরলাল আসিয়া আমার হাতে একখানি খামেভড়া পত্র দিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময়ে বিশেষ করিয়া বলিয়া গেল, "বিশেষ কোন উদ্বেগের কথা নাই; আপনি সুস্থ হইয়া অবসর মত পাঠ করিবেন।" আমি কিন্তু এক মুহূর্ত্তও অপেক্ষা করিতে পারিলাম না। মনে হইল যে, যে-যোগেশ নিত্য পঞ্চাশবার করিয়া আমার বাসায় আসিয়া থাকে, তাহার এমন কি দরকার হইল যে, নিজে না আসিয়া আমাকে পত্র লিখিয়া পাঠাইল? বলা বহুল্য যে আমি সকল কাজ ফেলিয়া আগে তাহার পত্রখানা পড়িতে বসিলাম। পত্রে লিখিত ছিল :—

"ভাই মণি!

বড় দুঃখে আজি আমি তোমাকে এই পত্র লিখিতে বসিয়াছি। এসময়ে আমার মনের অবস্থা যে কিরূপ, তাহা একমাত্র অন্তর্য্যামী নারায়ণ ভিন্ন আর কে জানিবে? ভাই! আমায় ক্ষমা করিও। আজি আমি তোমার হৃদয়ে যে গুরুতর আঘাত করিলাম, তাহা তুমি সহজে সহ্য করিতে পারিবে না।

# পূজার অর্ঘ্য

ভাই! তুমি আর কখনও আমাদের বাসায় আসিও না, আর কখনও মানসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও না। আমি পিতৃদেবকে অনুরোধ করিয়া ব্যর্থমনোরথ হইয়াছি; তিনি তোমার সহিত মানসীর বিবাহ দিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন।

তোমার কাছে আর আমি কেমন করিয়া এ মুখ দেখাইব? এতদিন হইতে আমি তোমার যে-আশাতরু বর্দ্ধিত করিয়া আসিতেছিলাম, আজি আবার আমাকেই তাহার মূলোচ্ছেদ করিতে হইল। এ দুঃখের সান্ত্বনা কোথায়? আজি হইতে সপ্তাহ কালের মধ্যে আমি তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব না; এই এক সপ্তাহ ধরিয়া আমি নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতে চাই।

পিতৃদেবকে আমি যথেষ্ট বুঝাইয়াছি; যথেষ্ট অনুরোধ করিয়াছি; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। তিনি বলিলেন—"মণীন্দ্র কুলীন বটে, কিন্তু তাহারা বারেন্দ্র, আমরা রাঢ়ী; সুতরাং তাহার সহিত মানসীর বিবাহ হওয়া অসম্ভব।" আমি তাঁহাকে অনেক কারয়া বুঝাইলাম; বলিলাম,—"রাঢ়ী-বারেন্দ্রে বিবাহ হইলে কি এমন দোষ হইবে বাবা? উভয়ের বংশ এক ভিন্ন ত দুই নয়; কেবল ভিন্ন ভিন্ন স্থানে থাকার দরুণ ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়াছে। এমন অবস্থায় এ সম্বন্ধে আপত্তি করিবার কি কারণ থাকিতে পারে?" আমার বাক্যে পিতৃদেব গম্ভীর হইয়া

বলিলেন,—"তোমরা ছেলে মানুষ, আগাগোড়া না ভাবিয়াই হঠাৎ যে সে কাজে হাত দিয়া ফেল। তুমি না হয় আজ গায়ের জোরে এমন একটা কাজ করিয়া ফেলিলে, কিন্তু সমাজ তাহা মানিয়া লইবে ত? ইহার উত্তরে আমি তিলার্দ্ধও অপেক্ষা না করিয়া বলিলাম,—"বাবা! যে সমাজ-সঙ্কীর্ণতার এতদূর প্রশ্রয় দিতে পারে, হয় তাহার আমূল সংস্কার হওয়া আবশ্যক, না হয় অচিরে তাহা পরিত্যাগ করাই সঙ্গত। আর সমাজের ভয়ে কি নিজের কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইবেন? একবার মানসীর মুখের দিকেও চাহিবেন না?" কিন্তু তিনি ইহাতেও টলিলেন না; বলিলেন,—"তোমাদের মত নব্য ছোক্‌রাদিগের কথা শুনিতে গেলে আর আমাদিগকে সংসারে থাকিতে হয় না। মানসীর জন্য কি আমি আমার বংশের অগৌরব করিব?" আবার আমি তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম; বলিলাম,—"বারেন্দ্রের সঙ্গে বিবাহ হইলেই বংশের এমন কি অগৌরব হইবে বাবা? আর মণীন্দ্রের সঙ্গে বিবাহ না হইলে মানসী হৃদয়ে যে আঘাত পাইবে, তাহার বেগ সে সাম্‌লাইতে পারিবে ত? আমার ত মনে হয়, মানসী উহা কিছুতেই সহ্য করিতে পারিবে না।" কিন্তু তবু তিনি শুনিলেন না, বলিলেন,—"সে যাহাই হউক, তাহারি জন্য আমি আমার বংশের কলঙ্ক করিব না।" ইহার উপর আর "আমার কি"

হাত আছে? পিতৃদেবের কোন কার্য্যের সমালোচনা করিবার অধিকার আমার নাই। কিন্তু তথাপি বলিতে হইতেছে যে, তাঁহার এই আচরণে আমি যে মর্ম্মান্তিক দুঃখ পাইয়াছি, এ জীবনে তাহা কখন বিস্মৃত হইতে পারিব না।

আজ এ পর্য্যন্ত। সপ্তাহ পরে আবার তোমার সঙ্গে দেখা করিব, এক্ষণে বিদায়। ইতি

অভিন্ন হৃদয়

যোগেশ।"

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সপ্তাহান্তে যোগেশ আমার বাসায় বেড়াইতে আসিল, এবং আসিয়াই আমাকে বেড়াইতে বাহির হইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। আমার মানসিক অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না,—বেড়াইতে বাহির হইবার ইচ্ছা আদৌ ছিল না; কিন্তু যোগেশের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলাম না।

দুইজনে বেড়াইতে বেড়াইতে পদ্মা-তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছিল; আকাশে

দুই একটী করিয়া নক্ষত্র উজ্জ্বল হীরকখণ্ডের ন্যায় ফুটিয়া উঠিতেছিল।

বেড়াইতে বেড়াইতে উভয়ে একখানা পাথরের উপর বসিয়া পড়িলাম। আমি একটু অন্যমনস্কভাবে আকাশের নক্ষত্রের দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছি, এমন সময়ে যোগেশ আমার হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে বলিল,—"ভাই মণি! সেদিন তোমার মনে আমি মর্ম্মান্তিক ক্লেশ দিয়াছি। আমার নিতান্ত দুর্ভাগ্য যে আজি আবার তোমাকে যাহা শুনাইতে হইবে তাহা তোমার মনে অধিকতর বেদনার কারণ হইবে।" আমি যোগেশের মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিলাম,—"তুমি কি সে কথা বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছ? আমি কিছুমাত্র কাতর হইব না; তুমি নিঃসঙ্কোচে সমস্ত কথা বলিয়া যাও।" যোগেশ তেমনই ভাবে স্নেহমিশ্রিত স্বরে বলিল, "তুমি কাতর হইবে কি না, তাহা আমি ভালরূপেই জানি। তবে আজই হউক, আর কালই হউক, তোমাকে একথা শুনিতেই হইবে; সুতরাং আর তাহা গোপন করিয়া কি হইবে? মানসীর বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে। পাটনার গোয়েন্দা পুলিশের ডেপুটী সুপারিণ্টেন্ডেণ্ট রায় বাহাদুর কৃষ্ণসদয় মুখোপাধ্যায় মানসীর পাত্র মনোনীত হইয়াছেন।"

আমি। তোমরা কি মানসীকে জবাই করিবার ব্যবস্থা

করিলে ? এই বৃদ্ধ গোয়েন্দার হাতে পড়িয়া জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষিতা বালিকার জীবন কি দুর্ব্বহ হইবে, তাহা কি কখন কল্পনা করিতে চেষ্টা করিয়াছ ?

যোগেশ। আমি জানি এ বিবাহ মানসীর পক্ষে মৃত্যুতুল্য। তাহার ন্যায় জাতীয় ভাবের ভাবিকা দেশগতপ্রাণা বালিকা এই-রূপ একটা দেশদ্রোহীর হাতে পড়িলে তিলে তিলে দগ্ধ হইয়া মরিবে। কিন্তু কি করিব! পিতৃদেবের মতে এই বৃদ্ধ রায় বাহাদুরই মানসীর যোগ্যপাত্র। কেন না, তিনি একাধারে কুলীন, রাঢ়ী, ঐশ্বর্য্যশালী ও গবর্ণমেণ্টের অসীম সম্মানভাজন। একাধারে এতগুলি গুণ আর কোথাও পাইবেন না বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস।

আমি। এই কৃষ্ণসদয়বাবুরই স্ত্রী কি গত পূজার সময় দুই তিনটি শিশু সন্তান রাখিয়া মারা গিয়াছেন ?

যোগেশ। হাঁ।

আমি। সে শিশু সন্তানগুলির এক্ষণে কে লালন-পালন করিতেছে ?

যোগেশ। তাহাদের লালন-পালনের জন্যই তিনি এই চুয়ান্ন বৎসর বয়সে পুনরায় বিবাহ করিতেছেন।

আমি। তাহাই যদি হয়, তবে তিনি তাঁহার বড় ছেলে সিদ্ধেশ্বরের বিবাহ দিলেন না কেন ? সে ত বিবাহের উপযুক্ত

হইয়াছে ? আমি যখন পাটনায় ছিলাম, তখন নির্ম্মল ডাক্তারের সঙ্গে সে অনেকবার আমার বাসায় গিয়াছে।

যোগেশ। তা আমি বলিতে পারি না।

আমি। তোমার সম্মতি অনুসারেই কি এ বিবাহ হইতেছে ?

যোগেশ। না।

আমি। তবে তুমি কি করিবে ?

যোগেশ। বিবাহের সময় আমি বাড়ী থাকিব না।

আমি। আমার মনে হয় বিবাহের পূর্ব্বেই তোমরা মানসীকে আফিং খাইতে দিলে ভাল করিবে। তোমরা বালিকার কোমল হৃদয়ে যে কঠিন আঘাত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছ, সে আঘাতে বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয় ভাঙ্গিয়া চূর্‌মার্ হইয়া যাইবে।

দুইজনেই অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নীরব হইয়া রহিলাম মাথার উপরে অন্ধকার আকাশে নক্ষত্র জ্বলিতেছিল, পদনিম্নে ভীমনাদিনী পদ্মা তরঙ্গের উপর তরঙ্গ তুলিয়া মহাশব্দে প্রবাহিত হইতেছিল ; স্নিগ্ধ নৈশ সমীরণ পদ্মার অন্ধকারময় বিশাল বক্ষের উপর দিয়া রহিয়া রহিয়া বহিয়া যাইতেছিল। কিন্তু এ সকল কেবল ভাবুকের চক্ষে, আমার নিকট এ সব কিছুই নয়। আমার তখন হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল, চক্ষে অন্ধকার দেখাইতেছিল, পৃথিবী একেবারে শূন্যময় বলিয়া বোধ হইতেছিল। কতক্ষণ এইভাবে কাটিয়া গেল

জানি না। অবশেষে যোগেশ আমার হাত ধরিয়া বলিল,—"চল ভাই রাত হইয়া গিয়াছে, এখন গৃহে ফিরি।" তখন দুইজনে ধীরে ধীরে বাসায় ফিরিলাম।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রত্যূষে বৈঠকখানা-গৃহে বসিয়া আমি মনোযোগ সহকারে একখানি মাসিক পত্র পাঠ করিতেছি, এমন সময়ে যোগেশের প্রিয়ভৃত্য হরলাল আসিয়া প্রণাম করিয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কি হরলাল, কি সংবাদ ?" হরলাল বলিল, "আজ্ঞা কর্ত্তামা আপনাকে একবার ডেকেছেন।"

আমি। এখনই যাইতে হইবে কি ?

হরলাল। আজ্ঞা হাঁ, কাল দিদিমণির বিয়ের উপলক্ষে শ্যামাপূজা হবে, তাই তিনি আপনাকে ডেকে নিয়ে যেতে বল্লেন।

বড় বিষম সঙ্কটে পড়িলাম। একদিকে যোগেশের নিষেধ, অন্যদিকে গৃহিণীর আহ্বান, কোন্‌দিক রক্ষা করিব ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলাম না। অবশেষে হরলালকে এই বলিয়া বিদায় করিলাম যে, "আমার শরীর আজ বড় খারাপ, এখন যাইতে পারিব না। যদি পরে ভাল বুঝি, বৈকালে বেড়াইয়া আসিব।"

পরে ভাবিয়া ভাবিয়া ইহাই স্থির করিলাম যে, মানসীর বিবাহের সময় আমার রাজসাহী ত্যাগ করিয়া যাওয়াই সঙ্গত।

সেদিন শনিবার, যথারীতি কলেজের কাজ করিয়া ফিরিয়া আসিলাম। তাহার পরদিন রবিবার, এবং সোম ও মঙ্গল এই দুইদিন শ্রীপঞ্চমী উপলক্ষে কলেজ বন্ধ ছিল, সুতরাং একসঙ্গে এই তিনদিনের ছুটীতে আমার বেশ সুবিধা হইয়া গেল, সেই দিনই সন্ধ্যাকালে আমি দার্জ্জিলিং রওনা হইলাম।

যথাসময়ে দার্জ্জিলিংএ আসিয়া একটী বন্ধুর বাটীতে আতিথ্য গ্রহণ করিলাম। আমার চিন্তাক্লিষ্ট মস্তিষ্ক শীতল করিবার পক্ষে দার্জ্জিলিংএর শৈলশিখরই উপযুক্ত স্থান মনে করিয়া নিজেকে প্রবোধ দিতে লাগিলাম, এবং দুইটাদিন কোন রকমে কাটাইয়া দিলাম।

মঙ্গলবার প্রাতে আমি বৈঠকখানা-গৃহের উন্মুক্ত জানালাপথে অদূরবর্ত্তী পর্ব্বতগাত্রে মেঘের ক্রীড়া দেখিতেছিলাম। আমার প্রাণে তখন অনন্ত বেদনা; তথাপি জালা পাহাড়ের ক্রোড়ে সেই মেঘের ক্রীড়া বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। নিকটেই একটা দেবদারু গাছের ডালের উপর বসিয়া কতকগুলা কাক অতি কর্কশ স্বরে কাঁ-কা রব করিতেছিল। তাদের সেই কর্কশ শব্দে আমারি মনপ্রাণ যেন বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছিল। এক একবার মনে

করিতেছিলাম যে উঠিয়া কাকগুলাকে সে স্থান হইতে তাড়াইয়া দিয়া আসি। কিন্তু পর্ব্বতগাত্রে সেই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য—মেঘের কোলে সৌদামিনীর খেলা দেখিয়া আমি এতই আকৃষ্ট হইয়াছিলাম যে,এই উঠি উঠি করিয়াও উঠিতে পারিতেছিলাম না। এমনই সময়ে ডাকঘরের হরকরা আসিয়া আমার হাতে একটী জরুরী টেলিগ্রাম দিয়া চলিয়া গেল। ব্যস্তসমস্ত হইয়া টেলিগ্রামের কভারটা ছিঁড়িয়া পড়িয়া দেখিলাম। টেলিগ্রামে যাহা লিখিত ছিল, তাহার ভাবার্থ এই :—

"মণীন্দ্র! শ্রীমতী মানসী মৃত্যুশয্যায় শায়িত। মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া আসিয়া দেখা করিবে।

শ্রীমতিলাল চট্টোপাধ্যায়।"

টেলিগ্রাম পড়িয়া আমার মাথা ঘুরিয়া গেল, দুইহাতে বুকটা সবলে চাপিয়া ধরিয়া আমি বিছানায় যাইয়া শুইয়া পড়িলাম।

হৃদয়ের ভার একটু লঘু হইবামাত্র আমি বন্ধুবরের কাছে বিদায় লইয়া ষ্টেশনে যাইয়া ট্রেণে উঠিলাম। সমস্ত পথ উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তায় অতিবাহিত হইল। পরদিন বেলা আটটার সময় আমি রাজসাহীতে যাইয়া মতিবাবুর বাসার দ্বারদেশে উপস্থিত হইলাম।

সংবাদ পাইবামাত্রই শোককাতর বৃদ্ধ বাটীর বাহির হইয়া আসিলেন—আমাকে দেখিয়াই তিনি হো হো করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। বহুকষ্টে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া লইয়া গিয়া বৈঠকখানা ঘরে বসিলাম। তারপর চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে একে একে তিনি সমস্ত কথা বলিলেন।

বিবাহের রাত্রেই মানসী সকলের অলক্ষ্যে বাসর-ঘর হইতে পলায়ন করিয়াছিল। তারপর সে যখন তীরভূমি হইতে পদ্মাবক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়ে, তখন নিকটে কেহই ছিল না। গভীর রাত্রি; পদ্মার তীর তখন প্রায় জনশূন্য ; সুতরাং কেহই তাহার জলপতন লক্ষ্য করিল না। কেবল ভৃত্য হরলাল সেই সময় পদ্মাতীরে মল-ত্যাগ করিতে আসিয়াছিল। দূর হইতে সে মানসার অস্পষ্ট-মূর্ত্তিকে পদ্মাবক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িতে দেখিয়া তীরবেগে ছুটিয়া আসিল। তখনও মানসীর মস্তকের কেশরাশি জলের উপর ভাসিতেছিল; সুতরাং হরলাল একলম্ফে পদ্মাবক্ষে অবতরণ করিল। তারপর বহুক্ষণের চেষ্টায় সে যখন মানসীকে লইয়া তীরে উঠিল, তখন বালিকা সম্পূর্ণরূপে সংজ্ঞাহীনা। এই অবস্থাতেই আমার নিকট টেলিগ্রাফ করা হয়। মঙ্গলবার শেষ রাত্রি পর্য্যন্ত তাহার অবস্থা সমান ভাবেই ছিল ; চিকিৎসকগণের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল, কিছুতেই তাহার সংজ্ঞা উৎপাদন হয় নাই। তারপর উষা-সমাগমে

তাহার প্রাণবায়ু পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া যায়। মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে না কি তাহার ওষ্ঠাধর দুই একবার কম্পিত হইয়াছিল, এবং তাহা হইতে 'মণিদা' এই কথা অস্ফুটভাবে বাহির হইতে কেহ শুনিতে পাইয়াছিল।

দুঃখের উপর দুঃখ। মানসীকে বাঁচাইতে গিয়া হরলাল নিজের জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছে। তীরভূমি হইতে সে যখন পদ্মাবক্ষে লাফাইয়া পড়ে, তখন সে বক্ষে দারুণ আঘাত পাইয়াছিল; মানসীকে তীরে উঠাইবার অতি অল্পক্ষণ পরেই সে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়ে। চিকিৎসককে ডাকিয়া আনা পর্য্যন্ত ভর সহে নাই; ভয়ানক আঘাতের ফলে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ হরলাল প্রাণত্যাগ করে।

একান্ত শোক-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমি মতিবাবুর বাসা ত্যাগ করিয়া নিজের বাড়ীর দিকে চলিলাম। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতেই দেখিতে পাইলাম, দূরে নদীতীরে একস্থানে কুণ্ডলীকৃত ধূম্ররাশি শূন্যমার্গে উত্থিত হইয়া আকাশে বিলীন হইয়া যাইতেছে। বুঝিতে বাকী রহিল না যে, মানসীর নশ্বর দেহ পঞ্চভূতে মিশিয়া যাইতেছে। চক্ষে আঁধার দেখিলাম, সম্মুখেই একটা বকুল বৃক্ষ দেখিয়া তাহার ছায়াতলে উপবেশন করিলাম। তারপর যে কি হইল, তাহা আমার কিছুমাত্র

মনে নাই। যখন আমার জ্ঞান হইল, দেখিতে পাইলাম বাসায় আমার বিছানাতে শুইয়া আছি, আর যোগেশ আমার শিয়রে বসিয়া মাথায় বরফ দিতেছে। আমি কথা বলিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু পারিলাম না। যোগেশ আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিল, "তুমি আর খানিকটা ঘুমাও দেখি মণি!" আমি অতি ধীরে ধীরে তাহার হাত দুইখানা আমার বুকের উপর টানিয়া লইলাম, সঙ্গে সঙ্গে আমার দুই গণ্ড বহিয়া দুই বিন্দু তপ্ত অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

সম্পূর্ণ

## সুলেখক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত

অন্য কয়খানি পুস্তকের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয়।

### সুরেশবাবুর অপূর্ব্ব সামাজিক উপন্যাস

# মাতৃতীর্থ

বঙ্গের কথা-সাহিত্যে ভাব-বিপ্লব আনয়ন করিয়াছে, ইহা সত্যবাদী ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিতে বাধ্য। ইহাতে পাশ্চাত্যের বীভৎস আদর্শ, উশৃঙ্খলতার বিভীষিকাময় চিত্র, বা ব্যভিচারের তাণ্ডব-নৃত্য নাই; আছে সংযম ও পবিত্রতার মহৎ আদর্শ, পতিপ্রাণা সতীর অদ্ভুত পতিভক্তি, পত্নীগতপ্রাণ পতির অপূর্ব্ব পত্নীপ্রেম; উচ্চশিক্ষিত যুবকের মাতৃভক্তির স্বর্গীয় চিত্র; ভারতের গৌরবস্তম্ভ ঋষি মুনিগণের তপোবনের পবিত্র ও মধুর দৃশ্য; এককথায় হিন্দুর সনাতন আদর্শের মূর্ত্তিমান জলন্ত ছবি। ইহা প্রিয়জনকে উপহার দিবার একখানি মহামূল্য কোহিনুর বিশেষ। পিতা কন্যাকে, ভ্রাতা ভগ্নীকে, পুত্র মাতাকে, পতি পত্নীকে এই পুস্তক সাদরে উপহার দিতে পারেন। বাঙ্গালার প্রধান প্রধান পত্রিকাগুলি পুস্তকখানির সম্বন্ধে কি লিখিয়াছেন দেখুন।

**আর্য্যদর্পণ**—গ্রন্থকার বর্ত্তমান সমাজের দুর্দ্দশার ছবি আঁকিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। দাম্পত্য-জীবনকে কিরূপে সংযত ও পবিত্র রাখা যায়, তাহা উত্তমরূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। গ্রন্থকারের উদ্যম সর্ব্বথা প্রশংসনীয়।

**প্রবর্ত্তক**—নবীন গ্রন্থকারের শুচি-সংযত লেখনী সাহিত্য-সেবায় সাফল্যলাভ করুক, ইহাই প্রার্থনা।

**উত্তরা**—বইখানির বিষয়-বস্তুর মাঝ দিয়ে যে আদর্শ, যে ভাবটিকে প্রচার কর্‌বার চেষ্টা করেছেন, তাকে আমরা শ্রদ্ধা করি। যুবক ব্রহ্মচারী হবেন, পারিপার্শ্বিক জীবনকে ভালবাসা শ্রদ্ধা দিয়ে কল্যাণময় ক'রে তুল্‌বেন, দেশের ও দশের বেদনায় কাতর হ'য়ে উচ্চ আদর্শ-প্রতিষ্ঠায় জীবনকে উৎসর্গ কর্‌বেন, এ আমরা সকলেই চাই।

**হিন্দুরঞ্জিকা**—লেখা বেশ হইয়াছে। চরিত্রগুলি সমস্তই নিখুঁত হইয়াছে। আমরা পড়িয়া খুবই খুসী হইয়াছি।

**শক্তি**—পুস্তকখানি সৎ-ভাবোদ্দীপক। পড়িলে জীবনের একটা উচ্চ আদর্শ পাওয়া যায়। এই জাগরণের দিনে এ শ্রেণীর পুস্তকের বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে। গ্রন্থকারের সাহিত্য-সেবা সফল হউক।

**এতদ্ব্যতীত** 'আনন্দবাজার পত্রিকা', এবং ত্রিস্রোতা, উদ্বোধন ও হিতবাদী—প্রভৃতি পত্রিকা ও বঙ্গের অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি মুক্তকণ্ঠে পুস্তকখানির প্রশংসা করিয়াছেন। স্থানাভাবে উদ্ধৃত করা হইল না।

**মূল্য বারো আনা মাত্র**

সুরেশচন্দ্রের পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নাটক

# মহারাজা-সীতারাম

নাট্য-সাহিত্যের একখানি অমূল্য রত্ন। ভাবে, ভাষায় ও চরিত্র-চিত্রণে এই নাটক অতুলনীয়। ইহাতে বাজে ইয়ারকি বা কৃত্রিম প্রেমের হা-হুতাশ নাই, আছে মনুষ্যত্ব গঠনোপযোগী শিক্ষার যথেষ্ট উপাদান। বঙ্গগৌরব মহারাজ-সীতারামের জীবন-কাহিনী লইয়া ইহা রচিত। তাঁহারই সহধর্ম্মিণী বঙ্গ-বীরাঙ্গনা যোগেশ্বরী ও কমলার অদ্ভুত বীরত্ব-কাহিনী পাঠে নিশ্চয়ই আপনাদের হৃদয় গর্ব্বে ও উন্মাদনায় স্ফীত হইয়া উঠিবে। এককথায় ইহাকে বাঙ্গালীর শৌর্য্য-বীর্য্যের প্রতীক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। স্থানাভাবে মাত্র কয়েকটি অভিমত উদ্ধৃত করা হইল।

**আর্য্যদর্পণ**—গ্রন্থখানিতে সর্ব্বত্র সংযম, শুচিতা ও স্বদেশ-প্রাণতার একটা একটানা স্রোত প্রবাহিত। বাঙ্গালার প্রাচীন কীর্ত্তিকাহিনী এইরূপ ভাবে যতই আলোচিত হয়, ততই মঙ্গল। আমরা গ্রন্থকারকে সাদরে সাহিত্যক্ষেত্রে অভিনন্দন করিতেছি।

**হিতবাদী**—নাটকখানি সময়োপযোগী হইয়াছে। লেখার চাতুর্য্য আছে, ভাষায় মাধুর্য্য আছে। * * আজকাল বাজে পুস্তক থিয়েটারে আদর পায়। এইরূপ পুস্তকের অভিনয় হওয়া উচিত। ইহাদ্বারা প্রকৃত মনুষ্যত্ব ও স্বদেশপ্রেম দর্শকের মনে ফুটিয়া উঠিবে"।

**সঞ্জীবনী**—ইতিহাস বিখ্যাত মহারাজ সীতারামের স্বদেশ

ভক্তির উজ্জ্বল আলেখ্য এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে; নাটকের ভাষা, ভাব, দৃশ্যাদির সন্নিবেশ ও চরিত্র-সৃষ্টি সমস্তই সুন্দর হইয়াছে। নির্দ্দোষ আমোদ-ব্যপদেশে যুবকেরা শুধু আবৃত্তির মত বলিয়া গেলেও এই নাটকখানি বেশ উপভোগ্য হইবে।

**উত্তরা**—লেখকের ভাষা মার্জ্জিত, বলিবার শক্তিও আছে। এই পুস্তক পাঠে গ্রন্থকারের মধ্যে একটা বিশুদ্ধ স্বদেশ-প্রাণতার পরিচয় পাওয়া যায়।

**মনীষী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী**—মহারাজ-সীতারাম আগাগোড়া পড়িয়া খুব খুসী হইয়াছি। পুস্তকের প্রতিছত্রেই বাঙ্গালীর প্রতি প্রীতির প্রকাশ পাইয়াছে। * * গ্রন্থকারের ভাষা, ভাব ভাল; গল্পটীও ভাল; গল্প সাজানটীও ভাল। **মূল্য এক টাকা মাত্র**

গ্রন্থকার প্রণীত নূতন ঐতিহাসিক নাটক

# রাজা-গণেশ

শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। ইহাতে বাঙ্গালীর অপ্রকাশিত গৌরবময় ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায় পাইবেন। কেমন করিয়া একজন সামান্য বাঙ্গালী পরাধীনতার শৃঙ্খল চূর্ণ করিয়া বাংলার স্বাধীন নরপতি হইয়াছিল, এই পুস্তকে তাহার উজ্জ্বল আলেখ্য বর্ত্তমান। প্রত্যেক বাঙ্গালীরই পড়া উচিত। সাগ্রহে প্রতীক্ষা করুন।